বেগমের নাম দেবলরানী

পরিবেশক

সাহিত্যশ্রী

৭৩, এম. জি. রোড

কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ১৩৭২

☐ **লেজার টাইপ সেটিং**

লেজার কাম্পাস

১ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১৩

☐ **মুদ্রক :** নিউ প্রিণ্টার্স

১১২/১২ বেলেঘাটা মেন রোড

কলিকাতা-৭০০ ০১০

উৎসর্গ

আদরের মঙ্গল ও মিতুলকে—

দাদু

কীভাবে শুরু করব বুঝতে পারছি না। একথা সত্য যে আমি গুজরাটের একসময়ের অধীশ্বর রাই করণ বাঘেলার কন্যা। আমার একটি বড় বোনও ছিল। কিন্তু শিশুকালেই তার মৃত্যু হয়েছে। নিষ্কৃতি পেয়েছে। নইলে তার ভাগ্যও হত আমার মতো।

দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিনের দুই সেনাপতি একদিন যখন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল গুজরাটের ওপর তখন আমার বাবা তাদের বাধা দিতে পারেননি। আমার বয়স ছিল মাত্র ছয় মাস। বাবা আমাকে বুকে তুলে নিয়ে রাতের অন্ধকারে দেশ ছেড়েছিলেন। দেবগিরি-রাজ রামদেব তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এমনকি তিনি তাঁকে নিজের রাজ্যের একটি অংশ বাবাকে দিয়েছিলেন রাজত্ব করতে। সেখানেই আমি বড় হয়েছি। সুখে ছিলাম। শুধু একটা দুঃখ ছিল মনে। মা বাবার সঙ্গে না এসে সুলতানের সেনানীদের সঙ্গে দিল্লি চলে গিয়েছিলেন। যদিও জানতাম, রামদেবের বড় মেয়েকেও আলাউদ্দিন নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে হারেমে তুলেছিলেন। যুদ্ধে হেরে গেলে এমন অনেক কিছু ঘটে যায় যা আদৌও সম্মানজনক না হলেও বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হয়। বিজয়ী আর বিজিতের মধ্যে তো কোনও চুক্তি হতে পারে না, যদিও কখনও হয় তা লোক দেখানো আর একপেশে। পুরুষদের এই সম্মান রাখতে আত্মহত্যা করা যায় না। বিশেষ করে সেই পুরুষ যদি কোনও রাজ্যের অধীশ্বর হন। তাতে প্রজাদের অশেষ দুর্গতি হয়। সেই রাজা ভীরু বলে নিন্দিত হন। আমার বাবা পালিয়ে এসেছিলেন। জানি না সেজন্য গুজরাটের মানুষেরা কী ভেবেছিল তাঁর সম্বন্ধে।

আমার বাবার নতুন রাজ্যের নাম বাগলানা, নন্দারবার তার রাজধানী। মহারাষ্ট্রের এক অসাধারণ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে আমি ছোট থেকে বড় হয়ে উঠেছিলাম। নিজেদের অতীত সম্বন্ধে বাবা যা বলেছিলেন, সেইটুকুই সম্বল। আমার সতীমা আমাকে মানুষ করেছিল। সব কিছুই করত কিন্তু কথা কম বলত, আর মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যেত। আমি ডাকলে চমকে উঠত। আমি ওর সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলে হেসে পাশ কাটিয়ে যেত। অথচ সে আমাকে নিজের বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করেছে। আমার প্রতি তার স্নেহ-ভালবাসা মায়ের ভালবাসার তুল্য। আমি মাতৃস্নেহের স্বাদ পরিপূর্ণ পেতাম। একটু যখন বড় হলাম, একদিন আমার মনে হল, আচ্ছা সতীমায়ের বুকে দুধ এল কী করে? তাকে প্রশ্ন করলাম। সে একটু চুপ করে থেকে বিষণ্ণ কণ্ঠে বলেছিল, আমার বয়সী তারও একটি ছেলে হয়েছিল একই সময়ে। কিন্তু দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়। সেইজন্য বুকে দুধ ছিল। আর স্বামী? সতীমা বলেছিল, সে তো সৈন্য ছিল। নিশ্চয় সুলতান বাহিনী তাকে মেরে ফেলে দিয়েছে। খুঁজেও পাওয়া যায়নি। আমার মায়ের সম্বন্ধে জানতে চাইলেও অমন দায়সারা উত্তর মিলত। যদিও আমি বুঝতে পারতাম মায়ের ওপর তার ছিল অসীম

শ্রদ্ধা। তার আর বাবার মনোভাবের মধ্যে কোনও মিল খুঁজে পেতাম না। অথচ আমার প্রতি তার কী প্রগাঢ় ভালবাসা। আমার সামান্য অসুবিধায় সে ব্যস্ত হয়ে উঠত। এই সব দেখে আমার মনে হত, যে কোনও কারণেই হোক সতীমা আমার কাছে অনেক কিছু গোপন রেখে দেয়।

এককালে গুজরাটের অধীশ্বর থাকলেও আমার বাবার গর্ব ছিল যে তিনি খাঁটি রাজপুত। তিনি গুজরাটের রাজবংশের কেউ নন। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সূত্রে সিংহাসনে বসেছিলেন। কারণ গুজরাটের অধীশ্বরের কোনও উত্তরাধিকারী ছিল না। সেই মিথ্যা গর্বই বলতে পার আজ আমার সুলতান আলাউদ্দিনের পুত্রের বেগম হওয়ার একটি বড় কারণ। দেবগিরির রাজপুত্র সিংহনা দেব আমার কৈশোরেই আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি যথেষ্ট সাহসী ছিলেন. ছিলেন নিপুণ যুদ্ধ বিশারদ। দিল্লির সুলতানকে তিনি দুচোখে দেখতে পারতেন না। তাঁর বোনকে আলাউদ্দিন জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন বলে সুলতানকে তিনি কখনও ক্ষমা করতে পারেননি। শুনেছি দেবগিরি যখন আক্রান্ত হয়েছিল তখন তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ সেনাদের নিয়ে দক্ষিণে রাজ্যজয়ে ব্যস্ত ছিলেন। সেই রাজকুমার আমি নন্দারবার থেকে দেবগিরিতে গেলে আমার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন। আমি প্রথম প্রথম বুঝতে পারতাম না। তবু সঙ্কোচ হত। তিনি আমাকে খুব মিষ্টিস্বরে এটা ওটা প্রশ্ন করতেন। তাই দেখে ওর মা, দেবগিরির মহারানী একটু হেসে পুত্রকে বলতেন, ও আমার কাছে এসেছে, ওকে আমার সঙ্গে গল্প করতে দাও।

রাজপুত্র তাড়াতাড়ি সরে যেতেন। সিংহনা আমার চেয়ে অন্তত চোদ্দ বছরের বড়। দেবগিরির রাজপুত্র আমার সঙ্গে অমনভাবে কথা বলতেন বলে নিজেকে খুব সম্মানীয়া বলে মনে হত। কিছু দিনের মধ্যে সব কিছুই বুঝতে পারলাম।

মাঝে মাঝে দেবগিরিতে যেতাম। নন্দারবারে আমার সখী দময়ন্তী ছাড়া আর কেউ ছিল না। তাই এক এক সময় একঘেয়ে লাগত। চলে যেতাম দেবগিরির রানীর কাছে। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। একবার তিনি আমাকে বললেন—তুমি কীভাবে এলে?

হঠাৎ একথা কেন জিজ্ঞাসা করলেন বুঝলাম না। আমি বললাম—কেন, ঘোড়ায়?

—দোলায় নয়?

—না। রানীমা আমি কি কোনও অন্যায় করেছি?

—না, অন্যায় কিছু করনি। তবে বিপদ হতে পারত।

—কেন?

—ফুল দেখে খালি ভ্রমর আসে না অন্য কিছুও আসে। তারা শুধু গুন-গুন করে না। মধুপান করে, বোঁটা থেকে ছিঁড়ে নিয়ে দলিত মথিত করে।

—বুঝলাম না।

—আর বুঝতে হবে না।

আমাদের গল্পটল্প হয়ে গেলে তিনি রাজকুমার সিংহনাকে ডাকেন। তিনি এলে বলেন—তুমি একটা অস্ত্র নিয়ে একে নন্দারবারে পৌঁছে দিয়ে এসো।

সিংহনার সারা মুখে খুশির আভা ফুটে উঠেছিল। আমারও কী ভাল লাগল। আমাকে কত সম্মান দেয়। আজ চলতে চলতে আলাপ করতে ভালই লাগবে।

মহিষী বলেন—সুলতানের কিছুকিছু সৈন্য মাঝে মাঝে টহল দিতে দিতে এদিকে চলে আসে। তুমি কখনও একা এসো না দেবলরানী।

—আমি বাবাকে বলব, এবার থেকে সঙ্গে লোক দিতে।

—তোমার কোনও খেলার সাথী নেই?

—আছে। দময়ন্তী। বাবার মন্ত্রীর মেয়ে। খুব ভাল। অনেক জানে শোনে।

—যতই জানুক, বুঝতে পারছি সে খুব সরল। ঠিক তোমার মতো।

—'সরল মানে কি বোকা?

রানীমা একটু জোরেই হেসে ওঠেন। সিংহনাও হেসে ফেলেন।

রানীমা বলেন—সরল মানে বোকা নয়। যারা খুব ভাল, তাদের সরল বলে।

রাজপুত্র বলেন—চল, যেতে যেতে আমি 'সরল' কথাটার মানে বুঝিয়ে দেব।

রানী কড়া চোখে পুত্রের দিকে চেয়ে বলেন—তোমাকে কিছু বোঝাতে হবে না। তুমি শুধু ওর দেহরক্ষী। এর বেশি কিছু নও।

—তাই বলে সারা রাস্তা চুপ করে থাকব। একটাও কথা বলব না? তাই কি কখনও হয়?

—বলবে, তবে বেশি নয়। কোনও কথার অর্থ বেশি করে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করো না।

আমি ভাবি, এতবড় একজন মানুষকে রানীমা এভাবে বলছেন? ইনি দক্ষিণে রাজ্য জয় করেছেন। আলাউদ্দিন যখন এসেছিলেন, তখন উপস্থিত থাকলে এঁর বোন রক্ষা পেতেন। শুনেছি বাল্যকাল থেকেই ইনি সৈন্য পরিচালনা করেন। তাই রানীমায়ের কথায় আমি মনে ব্যথা পেলাম।

বললাম—উনি আমার সঙ্গে বরাবর খুব ভাল ব্যবহার করেন। উনি আমাকে যত সম্মান দেখান আর কেউ তত দেখায় না।

রানীমা পুত্রকে বলে ওঠেন—তাই নাকি? এত সম্মান দেখাও?

দেখি, রাজপুত্র মায়ের কথা শুনে অধোবদন হয়। এঁদের কথা বোঝা ভার।

পথে পাশাপাশি অশ্বপৃষ্ঠে আমরা চলছিলাম। সময়টা ছিল বর্ষার পরে। প্রকৃতিতে একটা উষার সরসতা। বড় বড় নিমগাছ প্রকাণ্ড কাণ্ড নিয়ে পথের দুই পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের শাখা-প্রশাখার অসংখ্য পত্রাবলী ছায়া বিস্তার করে ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছিল। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল রাজকুমার যেন আমার সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু তিনি মাতৃভক্ত। হয়ত সারাপথ নীরব থাকবেন।

আমি বলি—সরল মানে কী?

তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর অশ্ব আমার অশ্বের পাশে নিয়ে এসে বলেন—সরল মানে

পৃথিবীর জটিলতা আর কুটিলতা যার মনে ছায়া ফেলতে পারে না। তুমি বুঝবে না দেবলরানী। আর একটু বড় হলে তোমাকে সব বুঝিয়ে দেব।

—কত বড় হলে?

—আরও ধর তিন বছর পরে।

—সে তো অনেক দিন। তখন কি আমি নন্দারবারে থাকব?

—কোথায় যাবে?

আমি সঙ্কুচিত হই। আমি জানি ওই বয়সে মেয়েরা সাধারণত স্বামীগৃহে যায়। কিন্তু রাজপুত্রকে তো সেকথা বলা যায় না। তাই কিছু বলি না।

রাজপুত্র একসময় বলেন—তোমার চিরদিনের জন্য দেবগিরিতে আসায় আপত্তি আছে দেবলরানী?

—চিরদিন?

—হ্যাঁ, সেখানকার বধূ হয়ে?

একথা আমার মনে কখনও আসেনি। ওঁকে দেখি আমি দেবগিরির রাজপুত্ররূপে। তিনি বীর। অতীতের অনেক কিছু জানেন। আমার মায়ের কথাও উনি জানেন। কিন্তু এসব নিয়ে আমাকে কিছু বলেন না। কতটুকু বা কথা হয়েছে? আজ বরং কিছুটা সময় পাওয়া গিয়েছে।

—আমার কথার উত্তর দেবে না?

আমি থতমতো খেয়ে যাই। তাড়াতাড়ি বলি—আমি তো জানি না। আপনি বরং বাবাকে জিজ্ঞাসা করুন।

—তাই ভাল। তুমি সত্যিই কিছু জানো না। তোমার বাবাকেই বলব। তুমি তোমার সখীকে জিজ্ঞাসা করত, সে কী বলে?

উৎসাহিত হয়ে বলি—তাই ভাল। আজই জিজ্ঞাসা করব।

—তোমার মনে কোন সাধ নেই?

—কোন্ সাধ?

—মানুষের কত কিছু ইচ্ছা হয়। আমার যেমন শৈশব থেকে ইচ্ছা দিগ্বিজয়ী বীর হব। অথচ দেখ আমাদের রাজ্যই দিল্লির সুলতান দখল করে ভগিনীকে তুলে নিয়ে গেল। সাধ পূর্ণ হওয়া খুব কঠিন। স্বপ্ন তো পূর্ণ হয়ই না। তুমি স্বপ্ন দেখ?

—হ্যাঁ, দেখি। কিন্তু আমার একটা সাধ আছে।

—কী সাধ? আমাকে বল, আমি পূর্ণ করব।

—সেই সাধ যে পূর্ণ হওয়ার নয়।

—আমাকে শুধু একবার বল লক্ষ্মীটি। আমি আজীবন চেষ্টা করে যাব।

আমার সারা শরীরে সেই দিন সেই মুহূর্তে কিসের যেন তরঙ্গ বয়ে গিয়েছিল। এখনও হয়? মনে হচ্ছিল পাশের মানুষটিকে মনের সব কথা খুলে বলা যায়। দময়ন্তীকে বলেও এত নির্ভর করা যায় না।

—বল দেবল।

—এ যে সত্যিই স্বপ্ন। আপনি বলছিলেন, স্বপ্ন পূরণ হয় না।

—তবু বল। স্বপ্ন পূরণ করার অসাধ্য সাধনের মধ্যেই তো মানুষের বেঁচে থাকার সার্থকতা। যে সব মানুষ তাঁর মনের স্বপ্নকে সত্য করে তোলেন তাঁদেরই সবাই মনে রাখে।

—আমার সাধ তেমন কিছু না। আমার সাধ হল দিল্লির সুলতানের হারেমে আমার মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করি, আমাকে শিশু অবস্থায় ফেলে রেখে স্বামীকে পরিত্যাগ করে কেমন করে তিনি সুলতানের হারেমে চলে গিয়েছিলেন? বলতে ইচ্ছে হয়, তোমার আত্মমর্যাদাবোধ বলতে কিছুই ছিল না? সুলতানের পরাক্রম আর ধনদৌলতই বেশি ছিল? মনুষ্যত্ববোধ থাক আর না থাক মাতৃত্ববোধ বলেও কি কিছু ছিল না? পশুদের মধ্যেও তো এসব থাকে। আরও অনেক কিছু বলতে সাধ হয় রাজকুমার। বলতে পারছি না।

—থাক, আর বলতে হবে না। সব বুঝতে পেরেছি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তোমার এই ক্ষোভ যেন আমার মনে প্রেরণা জাগায়। হয়ত তোমার সাধ একদিন পূর্ণ হবে। সেদিন অগোচরে নয় প্রকাশ্যে তাঁকে নিজের সামনে নিয়ে আসার আদেশ দেবে তুমি।

রাজকুমারের কথায় আমার মন আনন্দে ভরে উঠেছিল। মনে হয়েছিল তাঁর চেয়ে আপনজন পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই। বাবাও নন।

কিন্তু সেদিনের সেই অনুভূতি ছিল ক্ষণস্থায়ী। বয়স্করা এই সব অনুভূতির কোনও মূল্য দেয় না। তারা অনেক ভেবেচিন্তে নিজেদের মতো করে ঘুঁটি সাজাতে ব্যস্ত থাকে সব সময়। তারা জানে না, একটা দুরন্ত শিশু সবার অলক্ষ্যে বসে বসে মিষ্টি হাসছে আর সাজানো ঘুঁটি এলোমেলো করে দিচ্ছে।

সেদিনের রাজপুত্রের ব্যবহারে আমার হৃদয়ের কোথাও যেন কিসের অঙ্কুরোদ্গম হয়ে উঠতে চাইছিল। কিন্তু আমার জন্মদাতার কঠোর আঘাতে সেটি ছিন্ন হল। রাজকুমার একদিন নিজে বাবার কাছে এসে আমার পাণিপ্রার্থনা করলেন। বাবা অস্বীকার করলেন।

সতীমার মুখে একথা শুনে আমি বিস্মিত হলাম। আমি ভেবেছিলাম, এইভাবে বলা নিয়ম বলে উনি বাবাকে বলেছিলেন। উনি জানতেন বাবা সম্মতি জানাবেন। সতীমাকে আমি কদাচিৎ বিচলিত হতে দেখি। কিন্তু সেদিন সে বিচলিত হয়ে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে বলল—তোমার মারাত্মক ক্ষতি হয়ে গেল দেবল।

—কেন?

—এখন বুঝবে না। পরে নিশ্চয় বুঝবে।

বাবার মধ্যে সেদিন তাঁর বংশ-গৌরবের গর্ব চাড়া দিয়ে উঠেছিল। রাজকুমারের পিতার আশ্রয়ে থেকেও নিজের ভুয়ো বংশমর্যাদার মোহে সম্মত হলেন না। ভুলে গিয়েছিলেন যাঁর পুত্রকে তিনি প্রত্যাখান করলেন, তাঁরই আশ্রয়ে তিনি রয়েছেন। শুধু আশ্রয় দেননি, সম্মানও দিয়েছেন।

এই ঘটনা অতীতের। এখন মনে হয় সুদূর অতীতের। আমার মনের ভেতরটা ইতিমধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে দুঃখ শোকে আঘাতে আমূল বদলে গিয়েছে। কিন্তু মানুষ হিসাবে ভাবতে গেলে বাবার সেদিনের ব্যবহার আজও আমি মেনে নিতে পারি না। সেদিনের মতো আজও সঙ্কুচিত হই। রাজকুমারের সেদিনের ব্যথিত অপমানিত মুখের কথা আজ বিস্মৃত হলেও এখনও যেন আভাস পাই।

তারপর খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। ঘটে গেল সেই ধাবণাতীত ঘটনা। সেদিনের সেই ঘটনাকে তখন জীবনের এক অতি কলঙ্কিত অধ্যায়ে সূচনা বলে মনে হলেও আজ তাকে নিছক পটপরিবর্তন ছাড়া আর কিছু ভাবি না। সব নিয়তি। একটা সার কথা বুঝেছি। মানুব নিজে খুবই অসহায়। এই যে এত শৌর্য বীর্য পরাক্রম রক্তপাত নিষ্ঠুরতা, কিছুই কিছু নয়। পরম পরাক্রমশালী ভীতি উৎপাদনকারী আলাউদ্দিন খিলজীকে তো দেখলাম, তোমরাও দেখলে। কী ছিলেন আর কী হয়েছিলেন? আর কাফুর? আমার জীবনের অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছিল। তারপর দুদিনেই খেল খতম। এমনই হয়। কিন্তু যা ঘটার তা ঘটে যায়। তার আর কোন প্রতিকার নেই। যে যত কথাই বলুক, জীবনকে আর আগের মতো করে নেওয়া যায় না। অনেকে তো চিরকালের মতো অতলে তলিয়ে যায়। যেমন আমি।

আমার নাম দেবলরানী। বেগম হয়েও আমি দেবলরানীই থেকে গেলাম। কী বৈপরীত্য। কিন্তু এই নাম ছাড়া কেউ আমাকে অন্য নামে ডাকতে সাহস পায়নি। কারণ আমি ত্রাস সৃষ্টিকারী আলাউদ্দিন খিলজীর প্রিয়তম জ্যেষ্ঠপুত্র খিজির খাঁয়ের বেগম। কিন্তু নিছক পাঁচ-দশটা বেগমের মতো তো ছিলাম না। আমি প্রথমে খিজিরের প্রেয়সী, তারপরে তো বেগম। দিল্লীর সবার প্রতি তীব্র বিদ্বেষ নিয়ে আমি দিল্লিতে পৌঁছেছিলাম। সেই আমি বিধর্মী হয়েও নিজের অজ্ঞাতে আলাউদ্দিনের পুত্রের প্রতি সদয় হয়ে উঠলাম। তারপর আরও কিছু, আরও অনেক কিছুই। দুনিয়ার আকাশ বাতাস গাছপালা ফুল ফলের মধ্যে পেলাম স্বর্গীয় সুষমা। আমার জীবনের সেই এক অধ্যায় যা অতি ক্ষণস্থায়ী হয়েও মরূদ্যান। পৃথিবীর অন্য কারও কাছে সেই সময়টুকুর কানাকড়িরও মূল্য নেই জানি। কিন্তু আমার কাছে তো রয়েছে। না থেকে যে উপায় নেই।

মায়ের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ নিয়ে বেগম মহলে ঢুকেছিলাম সেই প্রথম দিনে। তখন বজ্রপাতও হয়নি, আকাশ থেকে কোন নক্ষত্রেরও স্খলন হয়নি। লক্ষ্য রেখেছিলাম মহলের প্রতিটি দ্বারে। অলিন্দে বাতায়নের সামনে এক একজন সুন্দরী তীব্র কৌতূহল নিয়ে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। জানতাম সুলতানদের একাধিক বেগম থাকে কিন্তু এত বেশি ভাবিনি কখনও। সুলতান তো প্রৌঢ়ত্ব ছাড়াতে চলেছেন, কিন্তু তাঁর অনেক বেগমই পরিপূর্ণ যুবতী। তবে সবাই কম-বেশি সুন্দরী।

সেই সময় দূরের একটি কক্ষ থেকে একজন বেগম উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে। আমি তো হতচকিত। পরক্ষণেই বলি আমাকে ছেড়ে সরে দাঁড়ান।

সঙ্গে সঙ্গে অনেক কণ্ঠের খিলখিল হাসি মহলের প্রতিটি দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। স্তম্ভিত রমণী বলে ওঠে—আমি তোমার হতভাগিনী মা।

—ও আপনি?

—মা বলে একবার ডাকো।

—আপনি তো বেগম। আমার মা বেগম ছিলেন না।

—তবু আমি তোমার মা।

—হ্যাঁ, আপনার জন্যে আমার জীবনটা শেষ হয়ে গেল।

আবার সেই হাসি। এবারের হাসি বড় কুৎসিত শোনায়। ভাবলাম, এই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে ওদের হাসির খোরাক হতে হবে। আরও জানি এই মহলেরই কোথাও দেবগিরির রাজকন্যা রয়েছেন। তিনিও আমাকে দেখছেন তবে এদের মতো আনন্দ পাচ্ছেন না। তাঁর দৃষ্টিতে নিশ্চয় ফুটে উঠেছে সমবেদনা। চোখ দুটো ভিজে উঠতেও পারে। তিনিও যে আমার মতো স্বেচ্ছায় আসেননি। আমি নিঃশব্দে মাতৃরূপী বেগমের সঙ্গে চলি। ও যে আমার গর্ভধারিণী এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাছাড়া একটা আড়ষ্টতা একটা বিতৃষ্ণা আমাকে ভেতরে ভেতরে ক্লান্ত করে তুলেছিল। সতীমা বলত, আমি খুব কোমল স্বভাবের। তাকে কি আর জীবনে দেখতে পাব? গর্ভধারিণীর সঙ্গে চলতে চলতে আমার ভেতরটা কেঁদে ওঠে।

হারেমের সব কক্ষই বোধহয় এমন সুসজ্জিত। আমার কোনও ধারণা ছিল না। এক এক কক্ষে যে সুলতান তাঁর মর্জিমাফিক এসে উপস্থিত হন। এটা আমার জানা ছিল না। আমি ভাবতাম, যে সব হিন্দু রাজার দু-তিনজন করে রানী থাকতেন মহারাজা অবসর মতো তাঁদের নিয়ে একসঙ্গে খেলা করতেন, আনন্দ করতেন। দময়ন্তীকে কখনও এ-বিষয়ে প্রশ্ন করিনি। ও বললেও বলতে পারত।

গর্ভধারিণী আমাকে সযত্নে তার পালঙ্কের ওপর বসতে দেয়। তারপর কাঁদতে কাঁদতে বলে—আমি তোমাকে এখানে চাইনি। কিন্তু আর পারলাম না। আমার বুকের মধ্যে মরুভূমি হয়ে গিয়েছে। খাঁ-খাঁ করে সব সময়। পাগল হয়ে যেতাম।

আমি সাধারণত বেশি কথা বলি না। বলতে পারিও না। কিন্তু আজ আমাকে কিসে যেন ভর করল। আমার জিভের আড় হঠাৎ ভেঙে গেল। কথা বলার সময়ের লাজুক ভাব কোথায় মিলিয়ে গেল। প্রচণ্ড মানসিক চাপ আর দীর্ঘপথ অতিক্রমের জন্য বোধহয় এমন হল।

তার কথার উত্তরে আমি বলে ফেললাম—কোনও ক্ষতি ছিল না।

স্তব্ধ বেগম বেদনাহত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পরে সে বলে—না ক্ষতি ছিল না। সত্যিই ক্ষতি ছিল না। সুলতানের কোনও বেগম উন্মাদ হল, তাতে কার কি? সুলতানেরও নয়। দুদিনেই তিনি ওকথা ভুলে যাবেন। হারেমে বেশি উৎপাত করলে বড় জোর আমাকে শেষ করে দেওয়ার হুকুম দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। কিন্তু ভুলে যেও না, আমি তোমার বাবার মত রাজপুত-রক্তের কলঙ্ক নই। আমি একজন রাজপুত

দুর্গেশনন্দিনী। আমার বাবা বীর ছিলেন। তিনি দুর্গ রক্ষা করতে প্রাণ দিয়েছিলেন। আমার মা সহমরণে গিয়েছিলেন।

—তাই স্বামীর সঙ্গে না গিয়ে সুলতানের লোকদের সঙ্গে এখানে চলে এসেছিলেন।

বড় বড় চোখে আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সে ফ্যাঁস-ফেঁসে গলায় বলে ওঠে—একথা কোথা থেকে শুনলে দেবল? এ যে মিথ্যে।

—আমার নাম কোথায় শুনলেন?

—ও নাম যে আমারই দেওয়া।

আমার ভেতরটা কীরকম করে উঠল। গর্ভধারিণীর কণ্ঠস্বরে হতাশা। তার চোখে যে আনন্দের আলো ফুটে উঠেছিল তা অনেক নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। আমি কখনও এত রূঢ় কথা বলিনি। বলতে জানতাম না। আজ আমার জিভ যেন বিষাক্ত সাপের মতোই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে হিস্‌হিস্ শব্দ করছে। আমি নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। তবে বেগমের অবস্থা দেখে মনের ভেতরে চাপা দুঃখ হল। আমার নামটা এ রেখেছিল। একে আর আঘাত করতে ইচ্ছা হল না। তবে অব্যাহতি দেব না। আমি তো শেষ হয়ে গিয়েছি। সব কিছু শুনিয়ে দেব। যে আমার এত বড় সর্বনাশ করেছে তাকে ক্ষমা করা যায় না। মহারাষ্ট্র আমার জন্মভূমি না-হলেও আমার দেশ। শিশুকালে মাতৃভূমি থেকে নির্বাসিত হয়েছিলাম। তারপর আর একবার নিজের দেশ, নিজের মানুষজনের কাছ থেকে চিরনির্বাসিত হলাম। নিজের বাবাকেও আর দেখতে পাব না। দময়ন্তী বোধহয় এখনও আমার জন্যে কাঁদছে। তার বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছিল। আর আমার এই দশা আজ সামনের এই নারীর প্রতিহিংসাপরায়ণতার জন্যে। নিজেকে সে ভাবে রাজপুত রমণী।

—আমি আর তোমাকে কিছু বলতে চাই না।

—বলো, মনের ভেতরে যা রয়েছে সব শুনিয়ে দাও। আমি তৈরি হয়েই আছি। তোমার বিন্দুমাত্র দোষ নেই।

—তবু। নিজেকে বড় হীন মনের বলে মনে হচ্ছে।

—তুমি কী করবে? তোমার মনকে শিশুকাল থেকে মিথ্যা বলে বলে বিষাক্ত করে তোলা হয়েছে।

—মিথ্যা।

—এর চেয়ে মিথ্যে আর কিছু হতে পারে না। আমাকে চেনে এমন কয়েকজন অন্তত তোমার বাবার নতুন রাজ্যে গিয়ে পৌঁছেছে। কিন্তু সত্যি কথা বলার সাহস তারা পাবে কোথায়? তাদের কোনও অপরাধ নেই।

—সতীমার অন্তত এই সাহস আছে বলে মনে হয়। সে তোমাকে চিনত।

—সতীমা? কে সে?

—তাকে আমি মা বলে জানতাম। শেষে জানতে পারি তা নয়। অথচ আমাকে সে নিজের বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করেছে।

—দুধ পেল কোথায়?

—তারও একটা ছেলে ছিল ঠিক আমার বয়সী। মারা গিয়েছিল। বাবা জানতেন।

উত্তেজিত বেগম পালঙ্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে ওঠে—দাঁড়াও দাঁড়াও। তোমার সতীমা কেমন দেখতে?

—ভাল।

—সেকথা জানতে চাইছি না। একটা বিশেষত্বের কথা বল, যাতে মানুষ চেনা যায়। যেমন কোনও একটা চিহ্ন—আচ্ছা, তার চিবুকের কাছে কি ছোট একটা লাল তিল আছে?

এবারে আমার অবাক হওয়ার পালা। বলে উঠি—হ্যাঁ, তুমি চেনো?

বেগম সাহেবার মুখ বিষণ্ণতায় ভরে ওঠে। মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ বসে থেকে ধীরে ধীরে বলে—বেচারা বাসন্তীর কপালে এতও ছিল!

—বাসন্তী কে?

—তোমার ওই সতীমা। সে আমারই পরিচারিকা ছিল।

—তবে? সে তো তোমার হয়ে বলতে পারত?

—বুঝতে পারছ না তুমি। ভয়ে বলতে পারেনি। কিন্তু কখনও আমার বিরুদ্ধে কিছু বলেছে কি?

আমি জানি আজকের বেগম সাহেবার প্রতি সতীমার অশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়ে যেত মাঝে মাঝে, আমাকে যা পীড়িত করত।

—না, প্রকারান্তরে সে তোমাকে ভাল বলার চেষ্টা করত।

—তোমাকে সত্যি কথা বলি তাহলে? তুমি এখন সাবালিকা, নিজের মেয়ে হলেও বলা যায়।

সেই সময় দুজন বাঁদী দুজনার জন্য খানাপিনার দ্রব্যসম্ভার নিয়ে এসে সেগুলো সুন্দরভাবে একটি শ্বেতপাথরের উঁচু জায়গায় সাজিয়ে রাখে। বেগম তাদের ইশারায় চলে যেতে বলে।

—কিছু মুখে দিয়ে নাও দেবল।

—গোমাংস?

—গোমাংস আমি স্পর্শ করি না। তা ছাড়া আমি বরাবর ফল মূল শাকসবজির পক্ষপাতী। গুজরাটে জন্মেছিলাম বলেই হয়ত। মাংস খাই, তবে গোমাংস কখনওই নয়।

—আমার খিদে নেই।

—অমন মনে হয়। তার কারণ আর কিছুই নয়। তোমাকে এভাবে জোর করে তুলে এনেছে বলে। তা ছাড়া আমার ওপর ঘৃণা।

আমি নীরব থাকি।

—খাও দেবল। পৃথিবীতে তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। তোমার বড় বোনটাও চলে গেল। ওর পক্ষে ভালই হয়েছিল। তোমার বাবা ওকে পছন্দ করত না। ও নাকি তোমার বাবার মায়ের মতো দেখতে হয়েছিল। নিজের মাকে সহ্য করতে পারত না। এখন তোমার

মনোভাব সেইরকম। ওর মা ওর চরিত্রহীনতায় অস্থির হয়ে একবার ওকে ত্যাজ্যপুত্র করতে চেয়েছিলেন।

—আমার জন্মদাতা সম্বন্ধে এভাবে বলবে না। তোমার সেই অধিকার তো নেই।

—কিন্তু বলতে যে হবেই। নইলে আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা বদলাবে না।

—আমার বাবা কখনওই চরিত্রহীন নন।

—তুমি এখনও ছেলেমানুষ। তবু তুমি নারী হয়ে জন্মেছ। তোমার নজরে কিছু না কিছু পড়া উচিত ছিল। অস্বাভাবিক কিছুই কি দেখনি? যেমন তোমাদের প্রাসাদে কোন সম্পর্কহীন নারীর আসা-যাওয়া। কিংবা তোমার বাবার কোনও অপরিচিত ব্যক্তির গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করা, যা রাজাদের ক্ষেত্রে সচরাচর চোখে পড়ে না? তেমন কিছুই কি দেখনি?

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে যায় বেতসী নামে সেই নারীর কথা। মাঝে মাঝে কোথা থেকে এসে যেন উদয় হত। সেজেগুজে আসত। এসেই আমার কক্ষে চলে আসত। এমন ভাব দেখাত যে আমি যেন তার কত আপন। আমার মোটেই ভাল লাগত না। ও এলেই দেখতাম সতীমা ম্রিয়মাণ হয়ে ঘরের প্রায়ান্ধকার কোণে বসে থাকত। বুঝতাম বিরক্ত হত। ও চলে গেলে বেতসীর কথা জানতে চাইলে বলত, সে চেনে না। গুজরাটের কেউ নয়। বেতসী এরপর বাবার কক্ষে গিয়ে অনেকক্ষণ কাটাত। সতীমাকে প্রশ্ন করলে বলত, বোধহয় গল্পগুজব করছে।

গর্ভধারিণী আমার দিকে চেয়ে বসেছিল। বলল—কী ভাবছিলে?

—কিছু না।

—এখন আর কোনও কথা নয়। সব কথা পরে হবে। এসো খেয়ে নাও।

—আমি খাব না।

—অমন করতে নেই। তোমার এখানে থাকার জন্য পাশেই একটা ঘর ঠিক করে রেখেছি। কোনও অসুবিধা হবে না। এসো খেয়ে নাও।

গর্ভধারিণী উঠে আমার মাথায় হাত রাখে। সেই স্পর্শের মধ্যে কী ছিল বলতে পারব না, আমার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। অধোবদন ছিল বলে ও দেখতে পায়নি। সেই একই সময়ে আমার মাথাতেও ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ে। চেয়ে দেখি, নারী কাঁদছে, যে নারী যুগ যুগ ধরে কেঁদে চলেছে।

আমার অশ্রুপ্লাবিত চোখ দেখে সে আমাকে জড়িয়ে ধরে। আমি যেন তার মধ্যে মিলিয়ে গেলাম। সে আর আমি এক। এমন অনুভূতি আগে কখনও হয়নি। সতীমাও আমাকে কত কারণে কতবার জড়িয়ে ধরেছে, এমন তো কখনও হয়নি।

কতক্ষণ ওই অবস্থায় ছিলাম মনে নেই। শেষে গুজরাটের ভূতপূর্ব মহিষী বলে—এসো, খেতে তো হবেই।

আমরা দুজনে খেতে শুরু করি। আমার আসল মা বলে—তোমাকে আমি সব বলব।

তুমি ভেবো না আমি নিজের সুখের জন্য এখানে এসেছি। কিন্তু সেসব কথা আজ নয়। এখন সব চেয়ে আগে প্রয়োজন তোমার দেহ আর মনের বিশ্রাম।

আমার আসল মা সেদিন আমাকে আর কোনও কথা বলেনি। শুধু শুনিয়েছিল হারেমের নানা কাহিনী। বলেছিল মালকা-ই-জাহানের কথা। হিন্দুরা যাকে বলে পাটরানী এই মাল্‌কা-ই-জাহান হল সুলতানের সেই রানী। আলাউদ্দিন নাকি একে প্রথম যৌবনে একটু ভালবেসেছিলেন। মায়ের মুখে শুনে আমার মনে প্রথম কৌতূহল জাগল হারেম সম্বন্ধে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল বাবার কথা। কান্না পেতে লাগল। আসল মায়ের প্রতি মন আবার বিরূপ হয়ে উঠল।

নাড়ীর টান বলেই বোধহয় মা আমার মনোভাব বুঝতে পারে। শুরু করে দেবগিরির রাজকন্যার কথা। বলে—মাল্‌কা-ই-জাহানের চেহারা দেখলে বোঝা যায় ভরা প্রৌঢ়ত্ব এসে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে মুখমণ্ডলের কয়েকটি রেখায় তার স্বভাবের কুটিলতা ভেসে উঠেছে যা যৌবনের ঔজ্জ্বল্যে ঢাকা পড়ে থাকে। অথচ দেবগিবির রাজকন্যার যৌবন এখনো অটুট। কয়েক বছর আগে তার একটি পুত্র হয়েছে। এটিই অবশ্য প্রথম এবং অবশ্যই শেষ।

—সত্যি।

—হ্যাঁ। দেখিয়ে আনব।

—উনি কেমন আছেন?

—আমি যেমন আছি, ঠিক তেমনি। থাকতে বাধ্য। তাই থাকছি। তবে ওর চেয়ে আমার আরও অসহায় অবস্থা। ওর সংবাদ জানার জন্য মা-বাবা এখনও জীবিত রয়েছেন। ওর বাবা রামদেব একবার কোনও উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে এসে কন্যার সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমার খোঁজ নেওয়ার জন্য দ্বিতীয় কেউ নেই।

—কী করে থাকবে? ওঁকে দেবগিরি থেকে ছিনিয়ে আনা হয়েছিল আর তুমি বাবার সঙ্গী না হয়ে সুলতানের সৈন্যদের সঙ্গে স্বেচ্ছায় এখানে চলে এসেছিলে।

—কে বলেছে এসব কথা?

—সবাই তাই জানে।

—বাসন্তী? তোমার সেই সতীমা? সে কী বলে?

—সে কোনও কথাই বলে না। সে একেবারে অন্যধরনের। পৃথিবীর কোনও কিছুর সঙ্গেই যেন তার সম্পর্ক নেই। মাঝে মাঝে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। কী যেন ভাবে, অবকাশ পেলেই।

—বেচারা।

—আমাকে খুব ভালবাসে। একেবারে মায়ের ভালবাসার মতোই। বোধহয় ওর ছেলের বয়সী বলে।

আমার আসল মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—বলতে গেলে ও তোমার মা-ই।

ওর ছেলে মারা যাওয়ায় ওর বুকের যে দুধ তুমি পেয়েছ, সেই ছেলে তোমার সহোদর না হলেও ভাই।

মায়ের এই অদ্ভুত কথা শুনে আমি কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে থাকি তার দিকে চেয়ে। শেষে বলি—তোমার কথা বুঝতে পারছি না।

মা আমার চোখের ওপর দৃষ্টি স্থির রেখে বলে—ওই মৃত ছেলেটি ছিল তোমার বাবার।

—একথার অর্থ?

—খুব সহজ। বাসন্তী চরিত্রবতী। তোমার বাবা তাকে প্রলুব্ধ করে নিরাশ হয়ে শেষে ভয় দেখিয়ে তার সর্বনাশ করে। তিন কুলে তার কেউ নেই। আমাকেও তাই কিছু বলতে সাহস পায়নি।

—ছেলের বাবা ছিল না?

—বাসন্তী অবিবাহিতা। সে আমার বয়সী হবে। আমি যখন বিবাহের পরে রাজপ্রাসাদে আসি তার কিছুদিন পরে তার এক দূর সম্পর্কের বৃদ্ধা আত্মীয়া প্রাসাদে এসে তার একটা আশ্রয়ের জন্য প্রার্থনা করে। বলে, তার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিলে নিশ্চিন্তে মরতে পারবে। আমি বাসন্তীকে আমার কাছে রেখে দিই। বিয়ে দেব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু সে কিছুতে রাজি হয়নি আমাকে ছেড়ে যেতে।

—তুমি এসব কী বলছ মা!

—ঠিক বলছি। তোমার বাবা আমাকে ফেলে রেখে শুধু তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিল। আমি শত অনুরোধ করলাম। চোখের জল ফেলতে ফেলতে পায়ে ধরলাম। তোমার বাবা লাথি দিয়ে আমাকে সরিয়ে বলেছিল, তাতে অনেক অসুবিধা। ধরা পড়ে যাবে। বাসন্তী কোথায় থাকত ও জানত। পরে যখন খেয়াল হল তোমার জন্যে বুকের দুধের প্রয়োজন হবে তখন হয়ত তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। নিশ্চয়ই তাই। আমি সঙ্গে সঙ্গে স্থির করলাম আত্মহত্যা করব। পরক্ষণেই মনে হল রাজপুত বংশে জন্মে যে নিজের রাজ্যের জন্য যুদ্ধ করতে ভয় পায়, যে নিজের প্রজাদের শত্রুর মুখে ঠেলে দিয়ে পালিয়ে যায়, সোমনাথ মন্দিরের বিগ্রহ আর তাঁর অগাধ ধনসম্পত্তি যে স্বচ্ছন্দে ফেলে রেখে নিজেকে বাঁচায়, তার জন্যে মরতে যাব কেন? আমি প্রতিশোধ নেব। আমি নিজে দিল্লির হারেমে যাব। সেখানে সুযোগ খুঁজব কী করে নিজের মেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে পারি। আজ আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে। ভেবো না এর জন্যে আমি আনন্দ পাচ্ছি।

আমার মনের ভেতরে ঝড় বইছিল। সব কিছু ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছিল। যে জন্মদাতা আমার জীবনের সবচেয়ে ভালবাসার আর আস্থাভাজন ছিলেন তাঁর এই পরিচয় আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। কিন্তু নন্দারবারের বহু ঘটনা এখন আমার কাছে একে একে দুই হয়ে উঠছে। শুধু বেতসী নয়, আরও দু-একজন নারীর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তাদের দেখেও সতীমা কেমন যেন ম্রিয়মাণ হয়ে উঠত। তার কথা ভেবে এখন নিজের

মায়ের সামনে ফুপিয়ে কেঁদে উঠি। মা আমাকে প্রবোধ দিতে দিতে বলে—এতদিন যাকে এত ভালবাসতে তার সম্বন্ধে এমন কথা শুনলে কাঁদা স্বাভাবিক।

আমি হাত তুলে বলতে চাই, বাবার জন্য কাঁদছি না। কিন্তু সেকথা বলতে পারি না। মা শেষে আমাকে নিজের কোলে টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরে।

আমার কান্না থামে একসময়। আমি স্বাভাবিক হই। মা বলে—তুমি আঘাত পাবে জানতাম। তবু না বলে উপায় ছিল না।

—বাবার জন্যে আমি কাঁদিনি।

—তবে?

—সতীমায়ের জন্য। ও সত্যিই আমার মা ছিল। দিনের পর দিন কত কিছু সহ্য করেছে। শুধু আমার মুখ চেয়েই বোধহয় বেঁচে ছিল। এখন কি আছে?

—বলতে পারি না। নাও থাকতে পারে। ওর মর্যাদাবোধ ছিল তীব্র। তবু শেষ পর্যন্ত মরতে পারেনি, প্রথমে নিজের গর্ভের সন্তানের জন্য তারপর আমার সন্তানের জন্য। ও আমাকে শ্রদ্ধা করত, আমার মনের অবস্থা বুঝত। আমি যদি সেই সময় আত্মহত্যা করতাম, ও নিশ্চয় তাই করত। সেটাই ভাল ছিল।

—ওর ছেলে কীভাবে মারা গিয়েছিল?

—বলতে পারি না। তবে বাসন্তীর নিশ্চয় ধারণা রয়েছে যে স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। নইলে ও আত্মহত্যা করত।

—তুমি বাবার ওপর কী প্রতিশোধ নিয়েছ?

—ও একদিন আমার বুক থেকে তোমাকে যেভাবে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল আমি ঠিক সেইভাবে ছিনিয়ে এনেছি।

—বাবা তো বেঁচে রইল।

মা নাক কুঁচকে বলে—তাকে আমি মানুষের পর্যায়ে ফেলি না! আমার মনে কখনও তাকে মেরে ফেলার কথা স্থান পায়নি। কীটপতঙ্গ পা দিয়ে পিষে ফেলে কি আত্মসুখ পাওয়া যায়?

—বাবা যদি আমাকে দেবগিরির রাজপুত্রের হাতে তুলে দিতেন তাহলে আমাকে বিধর্মী হতে হত না। রাজকুমারের খুব ইচ্ছা ছিল।

—স্বাভাবিক। তোমার রূপ দেখে কার না ইচ্ছা হয়? ওরও হয়ে থাকবে।

—রাজকুমার রাজপুত ছিলেন না বলে বাবা রাজি হননি।

মা বিদ্রূপের হাসি হেসে কেমন ভাবে যেন উচ্চারণ করে—রাজপুত। তবে তার সঙ্গে বিয়ে হলেই কি তুমি নিরাপদে থাকতে পারতে?

—কেন?

—সুলতান আলাউদ্দিন তার বাবাকে পছন্দ করেন। একটু শ্রদ্ধাও করেন বোধহয়। কিন্তু তাকে সহ্য করতে পারেন না। তার বোনকে সুলতান নিয়ে এসেছেন বলে সে

তাঁকে দেখতে পারে না। দেশকে সে ভালবাসে। দেখে নিও, শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে সুলতানের যুদ্ধ হবে। তাতে তার মৃত্যু হতে পারে।

—ক্ষতি ছিল না। আমি রাজপুত নারীর মতো জহরব্রত করে আত্মবিসর্জন দিতাম।

মা অন্যমনস্ক হয়ে বলে—তা পারতে।

মা একদিন আমাকে বলে—সুলতান একটু পরে তোমাকে দেখতে আসবেন। তুমি তৈরি থাকো।

—সব সময়েই তো বসে আছি, আমার কাজ কোথায়? সখী দময়ন্তীও নেই যে তার সঙ্গে গল্প করব কিংবা ঘোড়ায় চড়ে ঘুরতে যাব।

—দময়ন্তীর কথা পরে শুনব। ঘোড়ায় চড়া বোধহয় আর কখনো হবে না। আমি সুলতানকে এখানে নিয়ে আসব।

—নিয়ে এসো। আমারও দেখার আগ্রহ রয়েছে মানুষটাকে। তবে তাঁকে আমি শত্রু বলেই ভাবি।

—জানি।

—তিনি গুজরাটের সর্বনাশ করেছিলেন, দেবগিরিরও করেছেন।

—সব জানি না তবু—

—আমি কঠিন কথা এখনো বলতে শিখিনি। পারলে বলতাম তাঁকে।

—তোমার রূপের মতো, স্বভাবতই তুমি কোমল। সেটাই তোমার মহৎ গুণ, আবার সেটাই হয়ত দোষ। আমি এত কোমল স্বভাবের কখনওই ছিলাম না। তাতে কতটুকু লাভ হয়েছে?

—তোমার প্রধান ভুল তুমি আত্মঘাতী হতে পারনি। তুমি নিজে বিধর্মী হয়েছ। শেষ পর্যন্ত আমাকেও তোমার দলে টেনে এনে নিজের জেদ বজায় রেখেছ। কাজের কাজ কিছুই করনি।

—কোনটা কাজের কাজ?

—গুজরাটকে রক্ষা করা কিংবা স্বামীকে নিহত করা। কে কীট আর কে পতঙ্গ কেউ দেখবে না। দেখবে গুজরাটের শেষ মহিষীর শেষ আশ্রয়স্থল দিল্লির হারেম।

—আত্মহত্যা করলে?

—বলত, দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে, নারীর মর্যাদা রক্ষা করেছে।

মা একটু নীরব থেকে বলে—হুঁ। তখন সব কিছু ছাপিয়ে প্রতিহিংসার জ্বালা আমাকে পাগল করেছিল। তাই আমি অসামান্যা না হয়ে সন্তানহারা মায়েদের মতো সাধারণ পর্যায়ে নেমে এসেছি। সাধারণ বলেই এখন তোমার বাবা যে দগ্ধে দগ্ধে মরছে তার জন্য পিশাচিনীর সুখ অনুভব করছি।

সুলতানের আসার সময় হয়ে আসছে দেখে মা তার নিজের কক্ষে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সুলতান এলেন। দেখলাম এক অতি প্রৌঢ় ব্যক্তি যাঁর দিকে চাইলেই

বোঝা যায় সারা জীবন অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝার সম্মুখীন হয়েছেন। গৌরবর্ণের মানুষ রোদে পুড়লে যেমন দেখতে হয় গায়ের রঙ তেমন। সারা দেহে কোমলতা বলে কিছু নেই বরং একটা রুক্ষতা। চোখের চাহনি তীক্ষ্ণ। আমার বাবার একবারে বিপরীত চেহারা। বাবার রঙ ফেটে পড়ে। শরীর মসৃণ মোলায়েম। মুখের মধ্যে রুক্ষতার বালাই নেই। বেতসী আর সেই নারীকে দেখলে কেমন যেন হয়ে যেত। বাবার চেহারা আদর্শ রাজার চেহারা বলে ভাবতাম এতদিন। কিন্তু সুলতান তো অনেক উঁচু। এটাই ভাল বলে মনে হল আজ। কেন মনে হল জানি না। মনে হল এই চেহারার মানুষই অন্য দেশকে পদাঘাত করতে পারে। তার ভারও বইতে পারে। তাই এই বয়সে এসে একটু ন্যুব্জ, একটু অথর্বও বটে। এর কঠোরতা পুরুষোচিত।

সুলতান আমার দিকে চেয়ে হাসলেন। হাসিটা বেশ ভালই লাগল। বললেন—তুমি তো অসাধারণ সুন্দরী। সুন্দরীদের ভাগ্য ভাল হওয়া খুব কঠিন। বড় বেশি চোখে পড়ে যায়। তোমাকে আমি এনেছি, তোমার মায়েব ইচ্ছায়। আমার নিজের কোনও হাত নেই। তোমার অস্তিত্বের কথা আমার জানা ছিল না। তুমি যদি আমার কোনও ছেলের বেগম হও আমার খুব আনন্দ হবে। কিন্তু আমি তো জোর করব না। এখানে এসে তোমার কি মন খারাপ হয়েছে?

—হ্যাঁ।

—স্বাভাবিক। ঠিক হয়ে যাবে।

—হবে না।

সুলতান একটু থমকে যান, তারপব প্রশ্ন করেন—তুমি কি ওখানে কাউকে ভালবাসতে?

আমি চমকে উঠি তাঁর প্রশ্ন শুনে। একথা বলছেন কেন তিনি? এত কথা থাকতে একথা কেন?

একটু ভেবে বলি—সেকথা এখন বলে কী হবে? কোনও লাভ নেই।

—আমি তোমাকে পাঠিয়ে দেব।

মা সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে—না। ওকে পেযে আমি বেঁচে গিয়েছি। এখন ওকে আবার হারালে আমি বাঁচব না।

—তোমার মেয়ের ভালর জন্যও নয়?

মা নীরব হয়ে যায়।

সুলতান আমাকে প্রশ্ন করেন—তুমি সেই পুরুষের জন্য জীবন দিতে পার? ছেলেরা হয়ত পারে না, কিন্তু খুঁজলে দুনিয়ায় সেই রকমের মেয়ে কিছু পাওয়া যায়।

সতীমার শিক্ষায় আমার মুখ দিয়ে সচরাচর অসত্য কথা বের হতে চায় না। সতীমা বলত, মিথ্যা না বলে চুপ করে থাকা বরং ভাল। তাতে অনেক সময় এড়িয়ে যাওয়া যায়। মিথ্যা বলা পাপ। তাই সুলতানের প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি—তাকে আমি পছন্দ

করতাম, সে-ও আমাকে খুব পছন্দ করত। মনে হয়, সে আমার জন্য জীবন দিতে পারত। আমি হয়ত পারতাম না।

—কে সে?

—দেবগিরির রাজকুমার।

মুহূর্তের মধ্যে সুলতানের মুখমণ্ডলের অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করি। দেখলাম, শান্ত মুখ, ক্রোধে রক্তিম হয়ে উঠল। তিনি বলে ওঠেন—ওতো দিল্লির দুশমন। দেবগিরির মহারাজা খুব ভাল। কিন্তু ও আমাকে ঘৃণা করে। দেবগিরিকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়। আমার কারও হাতে ওর মৃত্যু অবধারিত। মহারাজাও সেকথা জানেন। তিনি আমাকে বলেছেন, রাজকুমারের মতিগতি ফেরাতে তিনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিন্তু মনে হয় ব্যর্থ হবেন। তার কাছে তোমাকে আমি কী করে পাঠাই বলো?

আমার ওপর কিসের যেন ভর হল। দেবতা, না অপদেবতা জানি না। নিজেকে অনেক পরিণত বলে মনে হল। সহজে সুলতানের দেখা পেয়ে বোধহয় অমন হল। বলি—রাজকুমার তো অন্যায় কিছু করেনি। দেশকে সে ভালবাসে। আপনি দেবগিরির সর্বনাশ করেছেন। সে কী করে সহ্য করবে? সে আমার বাবার মতো নয়, আমার মায়ের মতোও নয়।

আলাউদ্দিন শুকনো হাসি হেসে বলেন—এই প্রসঙ্গে আমি আর কিছু বলব না। তবে তুমি খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। মায়ের কাছেই থাক। অন্য কোনও ইচ্ছা থাকলে আমাকে জানিও।

সুলতানের স্পষ্ট কথার কোনও উত্তর দিতে পারি না। আসলে দেবগিরির রাজপুত্রের প্রতি আমার আন্তরিক কোনও আসক্তি ছিল না। ভালবাসা কাকে বলে, সেই অনুভূতিও তখন হয়নি। রাজপুত রমণীরা জহরব্রত করে সতীত্ব বাঁচায়। অনেকে আবার এমনিতেও স্বামীর চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। জানি না কেন। সতীমা আমাকে এ বিষয়ে কখনও কিছু বলেনি। বোধহয় সামনে দৃষ্টান্ত খুঁজে পায়নি। সতীমা তো সতী-অসতীর বাইরে। স্বামী-রূপে কাউকে বরণ করার সৌভাগ্য তার জীবনে আসেনি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, তেমন সুযোগ পেলে সে অবশ্যই সতী হত।

জীবনে প্রথম নিজের মাকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হওয়ার মতো কিছু হল না। তবে অনেক কিছু জেনে, মায়ের প্রতি বিদ্বেষ ভাব হ্রাস পেতে থাকল। এর প্রধান কারণ মায়ের প্রতি সতীমার শ্রদ্ধার প্রকাশ পেতে অনেকবার দেখেছি। সতীমা আমার জীবনের আদর্শ নারী। সে বিবাহিতা নয়। অথচ অন্যের সন্তান গর্ভে ধারণ করতে বাধ্য হয়েছে। এখন তো সবই প্রকাশ পাচ্ছে একে একে। সে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। একদিন চেষ্টাও করেছিল। মা তার হাবভাব বুঝতে পেরে তাকে জড়িয়ে ধরে কাতর প্রার্থনা করেছিল, সে যেন এই জগৎ ছেড়ে চলে না যায়। মা শুধু বলল, কী যাতনা নিয়ে সে বেঁচে ছিল, কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। তারপর তার গর্ভের সন্তান ধীরে ধীরে

বাড়তে থাকল। তার প্রতি সতীমার মাতৃস্নেহও বাড়তে লাগল। সেই সময় সতীমার মনে অনেক কল্পনার উদয় হত। তাকে মা একা একা হাসতেও দেখেছে। নিশ্চয় শিশুর নানা সময়ের কথা ভেবে। তারপর সে যখন আসন্ন প্রসবা, তখন একদিন প্রাসাদ থেকে উধাও হয়ে গেল। মা তখন একমাস বয়সী আমাকে নিয়ে ব্যস্ত। বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে বলতেন—ঠিক জায়গায় রাখা হয়েছে। প্রাসাদে তো কেলেঙ্কারি ঘটানো যায় না। মা ধিক্কার জানিয়ে বলেছিল—কেলেঙ্কারি যেন কত চাপা রয়েছে। এরপর মায়ের শত প্রশ্নেও বাবা বাসন্তী সম্বন্ধে একটি কথাও বলেনি। মায়ের ধারণা ছিল তাকে হয়ত হত্যা করা হয়েছে। আমি আসার পরে প্রথম বুঝল যে সে বেঁচে ছিল। কিন্তু তার সন্তান? তাকে কৌশলে হত্যা করা হয়েছে নিশ্চয়। কারণ বাসন্তী জানলে মহারাজের শত অনুরোধেও সে তাঁর সঙ্গে দেবগিরিতে যেত না। মা বলল, শুধু আমার মেয়ে বলেই সে তোমাকে তার মাতৃস্নেহের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছিল বুঝতে পারছি। আমার চেয়েও হতভাগিনী সে।

এসব কথা বলতে বলতে মা তার প্রকোষ্ঠে আমাকে জড়িয়ে ধরে ঝর ঝর করে কেঁদে বলে ওঠে—সেদিন আত্মহত্যা করতাম। শুধু তোমার জন্য পারিনি। সেই তোমাকে সে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমাকে শত্রুর মুখে ফেলে রেখে চোরের মতো রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেল। তাই আমি স্বেচ্ছায় হারেমে এসেছি। হ্যাঁ, জেনেশুনেই এসেছি। এতদিনে প্রতিশোধ নিয়েছি। তোমাকে আমি ছাড়ব না। সুলতান বললেও না। বাসন্তী কেন ওর সঙ্গে গেল বুঝতে পারি। তোমায় টানে। ও আমাকে বড় ভালবাসত।

আমি সেদিন স্তম্ভিত হয়ে বসে থেকে মায়ের এসব কথা শুনছিলাম। এর পর থেকে বাবার ওখানে ফিরে যাওয়ার সাধ আমার কেন যেন ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকল। মায়ের ওপর টানও বাড়তে থাকল। একথা সবাই জানে যে নারীরা যেমন কষ্ট সহ্য করতে পারে, তেমনি সব পরিস্থিতিতে ধীরে ধীরে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। পুরুষেরা অমন হয় না। হয়, তারা রুখে দাঁড়িয়ে জিতে যায়, নইলে হেরে শেষ হয়ে যায়। কোন্‌টা ভাল জানি না। তবে পুরুষেরা নারীদের এই ব্যাপারটা ভালভাবে জানে আর তার সুযোগ নেয়। তাই একে নারীদের দোষ বলব, না গুণ বলব জানি না।

মা একদিন জানতে চায়, এখানে আমার ভাল লাগছে কি না। অবান্তর প্রশ্ন। উত্তরে বলি—একটুও নয়। নিজেকে বন্দিনী বলে মনে হয়। বেগম না হয়েও আমি যেন পর্দানসীন।

—জানি দেবলা। তবে এদের সবাই পর্দানসীন। তোমার এই অতৃপ্তির জন্যে আমার যত ভাবনা। শত হলেও এরা বিধর্মী। এদের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সময় লাগবে। আমি ধাতস্থ হয়ে গিয়েছি মোটামুটি।

ধীরে ধীরে হারেমের সমবয়স্ক কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় হল। কিন্তু এরা দময়ন্তীর মতো নয়। এরা প্রাণভরে কথা বলে না। কিসের যেন বাধা। দময়ন্তীর মন কত উদার

ছিল। কত বেশি বুঝত সে। এরা একেবারে অন্যরকম। এরা এদের নিজেদের ভবিষ্যৎ কল্পনার মধ্যে মশগুল থাকে। তাই নিয়েই শুধু আলোচনা আর মন্তব্য। ভবিষ্যৎ বলতে কোন্ আমীরের ছেলের সঙ্গে সাদি হলে ভাল হয়। অন্য পুরুষের মুখ এরা দেখে কারও বাড়িতে বেড়াতে গেলে কিংবা শকটে করে পথে বের হলে। তাও আবার পর্দার আড়াল থেকে। পর্দা যদি একটু মোটা হয় তাহলে একটা কোণা সামান্য তুলে তার ফাঁক দিয়ে। কেউ কেউ একটু বেশি বেপরোয়া। পর্দা সরিয়ে শুধু মুখটুকু বাইরে রেখে পথচারীদের চমকে দেয়। এতেই তাদের আনন্দ।

দেবগিরি কিংবা বাবার রাজ্যে এমন হত না। সেখানে আমরা যখন তখন বাইরে যেতাম। কেউ ভ্রূক্ষেপও করত না। তবে আমার রূপ রয়েছে বলে অল্পবয়সী পুরুষদের চোখে পড়তাম বেশি। এটা বুঝতাম। অনেক নারীও আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ত। অনেক বৃদ্ধ বলেছে, সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এবারে প্রাসাদে ফিরে যাও রাজকন্যা। দময়ন্তী বলত, তোকে দেখে কত লোকের যে মাথা ঘুবে যায়, তুই তো দেখিসই না। আমি নিজের রূপ সম্বন্ধে কিছুটা সচেতন থাকলেও অতটা গুরুত্ব দিইনি কখনওই। বলতাম, দেখে দেখুক, তাতে আমার কী?

—তোর হয়ত কিছু নয়, কিন্তু তাদের মনে যে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিস। পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের আলোচনা আরও কত বিষয়ে হত। এমনকী যুদ্ধ বিষয়েও। সুলতানের কাছে দেবগিরির পতন আমাদের আমার বুদ্ধি অনুযায়ী বিশ্লেষণ করতাম। যদিও সেই পতন হয়েছিল বহু আগে। বাবা তো সোজা এখানে আসেনি। তার আগে তিনি আরও দু একটি রাজ্যে কাটিয়ে এসেছেন। সেই সব জায়গায় তেমন আতিথেয়তা পাননি। তখনও দেবগিরি আক্রান্ত হয়নি। বাবা সেখানে পৌঁছানোর কিছু আগে সমৃদ্ধশালী দেবগিরিকে তছনছ করেছিলেন সুলতান। তবু সেই দুর্বিপাকের মধ্যেও দেবগিরির অধীশ্বর রামদেব বাবাকে আপ্যায়ন করেছিলেন। হয়ত নিজেকে দিয়ে বুঝেছিলেন সুলতানের আক্রমণে বিধ্বস্ত এক রাজ্যের নরপতিব মর্মবেদনার কথা।

সেই সময় একদিন কথা বলতে বলতে দময়ন্তী বলেছিল, রাজকুমার সিংহনাদের দেশপ্রেমিক হতে পারেন, বীর হতে পারেন, কিন্তু কৌশলী নন। তাঁর মাথা আরও ঠাণ্ডা হলে ভাল হত। সেদিন সুলতানের নিজের মুখে সিংহনা সম্বন্ধে শুনে আমার মনে হয়েছিল দময়ন্তী কত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ধরে। সেই সময় আমি অত কিছুই বুঝতাম না।

এখানে হারেমের সমবয়সীদের কথার মধ্যে বুদ্ধির বালাই নেই। ঘুরে ফিরে একই কথা। সেই সাদি আর ওমরাহদের পুত্রদের সম্বন্ধে তীব্র কৌতূহল। বড়ই একঘেয়ে। আমাকে ওদের ভাল লাগত ঠিকই। কিন্তু একটা প্রচ্ছন্ন ঈর্ষাবোধও ছিল। বলত, তোমার আর কী? যা রূপ, কোন সুলতানজাদার সঙ্গে তো বাঁধা। তবু ওদের সঙ্গ মন্দের ভাল। বয়স্কা বেগমদের আমি সহ্য করতে পারি না। অথচ দেবগিরির বৃদ্ধা মহিষীকে কত ভালই লাগত। তিনি একেবারে অন্যরকম ছিলেন। বেগমদের দেখে মনে হয়, তাদের মধ্যে স্নেহ-ভালবাসা

বলতে কিছু নেই। হৃদয়হীন রূপসী এরা। সেই রূপও এক এক সময় বড় উৎকট বলে মনে হয়। আমার সমবয়সীরাও বড় কুৎসিত আলোচনা করে, এত কুৎসিত যে আলোচনা হতে পারে আমার ধারণা ছিল না। মনে হয় ঘেরাটোপের মধ্যে থেকে এরা এমন হয়েছে। স্বাধীনতা থাকলে এরা কত অন্যরকম হতে পারত।

মায়ের ওপর বিরূপতা অনেকটা হ্রাস পেলেও তাকে আমি মনে মনে নানাভাবে বিচার করার চেষ্টা করতাম। শেষে বুঝলাম, সতীমা যাকে শ্রদ্ধা করে সে সত্যি শ্রদ্ধার পাত্রী। অন্যান্য বেগমদের সঙ্গে না মিশে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। অথচ কারও সঙ্গে অসদ্ভাব নেই। তারাও মাকে একটু অন্য দৃষ্টিতে দেখে। এমনকী দেবগিরির রাজকন্যাও।

একদিন দুপুরে বেগমমহল যখন দিবানিদ্রায় মগ্ন আমি নিঃশব্দে গিয়ে মায়ের কক্ষে ঢুকলাম। সেই সময় তার বাঁদী দরজার সামনে ঢুলছিল। আমাকে দেখে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে সজাগ হওয়ার চেষ্টা করল। আমি ভেতরে ঢুকে পেছন ফিরে চেয়ে দেখি সে আবার ঢুলছে। সব বেগমদের পরিচারিকারাই এই সময় ঝিমোয়। মায়ের পরিচারিকা নিশ্চয় আমাকে মূর্তিমতী বেখাপ্পা বলে ভেবেছে। বোধহয় বুঝেছে আমি তখনও বেগমমহলের আদব কায়দা ইত্যাদিতে রপ্ত হইনি। আমাকে সে বাধা দেয়নি। কারণ সে জানে বেগম নিদ্রিত থাকলেও তাঁর নিজের মেয়ের অবাধ অধিকার রয়েছে সেখানে যাওয়ার।

আমি ভেতরে গিয়েও একবার ভাবলাম, মাকে জাগাব? কিন্তু আমার মনের মধ্যে তখন ঝড় উঠেছে। মায়ের প্রতি তীব্র আকর্ষণ আমাকে পাগল করে তুলেছে। তার কাছে গিয়ে তার কোলে আশ্রয় না নেওয়া অবধি আমার শান্তি নেই।

দেখলাম মা শয্যায় নেই। এদিকে ওদিকে চেয়ে দেখি এককোণে আবছা অন্ধকারের মধ্যে মা বসে রয়েছে হাত জোড় করে। স্তম্ভিত হলাম। এ যে পুজোর ভঙ্গি। পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। মায়ের চোখ বন্ধ। ঋজুভাবে বসে রয়েছে। পুজো না নমাজ? কিন্তু যুক্তপাণি তো দেখিনি কখনও? সেই সময় চোখে পড়ে মায়ের সামনে কালো রঙের ছোট গোলাকার একটি বস্তু। জিনিসটা কি ঠাহর করতে পারলাম না।

একসময়ে মায়ের ধ্যান শেষ হয়। সামনে ঝুঁকে মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে উঠে দাঁড়ানোর সময় সেই কালো বস্তুটি তুলে সামনেই একটি অনুচ্চ কুলুঙ্গিতে রেখে পেছন ফিরে আমাকে দেখে চমকে ওঠে।

—তুমি! ঘুমোওনি?

—আমি শুধু রাতে ঘুমোই।

মা হেসে বলে—আমারই ধাত পেয়েছ। তবে বেগমমহলের মত এত ঘুম-কাতুরে কাউকে দেখিনি।

আমার মনে আবার ঝড় উঠেছে। মায়ের উষ্ণতা, মায়ের স্পর্শের জন্য ভেতরটা

ছট্‌ফট্‌ করছে। মা আমাকে নিয়ে পালঙ্কে বসতেই আমি তার কোলে মুখ গুঁজে কেঁদে উঠি।

—কী হয়েছে দেবলা? কেউ কিছু বলেছে?

আমি মাথা নেড়ে জানাই—না।

—তবে? আমাকে খুলে বলো। আমি তোমার মা। আমাকে তুমি হয়ত আপন ভাবতে পারো না। কিন্তু মা কখনও মেয়ের ক্ষতি চায় না। তার দুঃখে মায়ের দুঃখই সব চেয়ে বেশি হয়।

—জানি। তুমি যে আমার মা, আমার আসল মা। আমি বুঝতে পেরেছি তোমার চেয়ে হতভাগিনী কেউ নেই। আমিও নই। আমি জানি আমার চেয়ে আর কাউকে তুমি বেশি ভালবাস না। আমি তোমার প্রাণ।

মায়ের দুই নয়ন বেয়ে অশ্রুর অবারিত ধারা নামে। সে আমাকে বুকে তুলে নিয়ে জড়িয়ে ধরে বলে—তুই বুঝতে পেরেছিস! আমার ছোট্ট দেবলা, তুই সত্যি বুঝতে পেরেছিস? আজ আমার কী শান্তি। সুলতানের হারেমে থেকেও এই শান্তি কখনও পাব স্বপ্নেও ভাবিনি। তুই কাঁদছিস কেন? সাধ্যাতীত না হলে আমি তোর দুঃখ দূর করব। তুই চলে যেতে চাইলে সুলতানকে বলে রাজি করাব। তিনি তো আমার জন্যেই তোকে এনে দিয়েছেন।

—কোথায় যাব মা? আর কে আছে আমার?

—যেখানে ছিলি।

—সেখানে কার কাছে যাব? ওই পাপী জন্মদাতার কাছে?

—দেবগিরির রাজকুমার?

—না তার ওপর আজ এতটুকুও টান নেই। আমি শুধু ভাবি সতীমায়ের কথা। সে আমার মায়ের মতো। তার বুকের দুধ খেয়ে আমি বড় হয়েছি। অথচ সেই দুধের ওপর দাবি ছিল তার নিজের সন্তানের। আমার কোনও সন্দেহ নেই, বাবা কাউকে দিয়ে তাকে হত্যা করেছে। আমার ভয় হয় মা, বাবা এবারে সতীমাকেও হত্যা করবে।

মা চোখ বড় বড় করে বলে—কেন?

—তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তাছাড়া সে বাবার অতীতের অজস্র পাপের একমাত্র সাক্ষী।

আমার কথা শুনে মায়ের মুখে আতঙ্কের ছায়া পড়ে। বলে—এইটুকু বয়সেই তুই এত গভীরভাবে ভাবতে পারিস?

—কিছুই ভাবতাম না মা, কিছুই জানতাম না। এই অল্প কয়েকদিনের মধ্যে আমি অনেক কিছু বুঝে ফেলেছি।

মায়ের কাছে বসে বসে আবোল তাবোল অনেক কিছুই বলে গেলাম আমি। একজন এসে অপরাহ্নের হালকা খাবার দিয়ে গেল। তারপর একসময় দিনের আলো কমতে শুরু

করল। সন্ধ্যা নামল। তবু আমার উঠতে ইচ্ছা করে না। বলি বলি করেও যে কথাটা এতক্ষণ বলতে পারছিলাম না, সেটা বলে ফেললাম।

—মা, আজ আমি তোমার কাছে শোব।

কথাটা শুনে মায়ের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণেই একটা অস্বস্তি মাকে পেয়ে বসে। সে একটু উস্‌খুস্‌ করে বাঁদীকে ডাকে। বাঁদী এলে বলে—সুলতান আজ হারেমে আসবেন কি না জেনে আসতে পারবে?

—চেষ্টা করব।

—যাও।

মাকে অসুবিধায় ফেলে আমার সঙ্কোচ হতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে বাঁদী এসে জানায় সুলতান অসুস্থ। হাকিম দেখছেন। তিনি হারেমে আসবেন না।

আমি মাকে জড়িয়ে ধরি।

একটু পর থেকেই লক্ষ্য করলাম এক একজন বেগম মায়ের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে আমি আজ তার কাছে থাকব কিনা। বুঝলাম, বাঁদী মায়ের সঙ্গে আমার কথা কান পেতে শুনেছে। তাই রটে গিয়েছে। বুঝলাম, এরই নাম হল হারেম। এখানকার জড় পদার্থেরও কান আছে। নীরবে নিভৃতে গোপনভাবে কিছু করলে বা বললেও কয়েক মুহূর্তের জন্য রটে যায় সারা হারেমে। অথচ দেবগিরির রাজ-অন্তঃপুরে মহারানীর সঙ্গে আমার বা অন্য কারও কথাবার্তার বিন্দুবিসর্গও কেউ কখনও জানতে পারেনি। এমনকী বাবার প্রাসাদে কিংবা প্রাসাদের বাইরে তাঁর পাপাচারের কথা তেমন ভাবে রটেছে বলে আমার মনে হয়নি। অবশ্য তখন আমি এত পরিণত ছিলাম না। আমার কাছে বাবা তখন ছিলেন সমস্ত পাপ দোষের ঊর্ধ্বে দেবতুল্য মানুষ।

সেই রাতে মায়ের সঙ্গে শুয়ে নিদ্রার কোনও লক্ষণই ছিল না দুজনার চোখে। মা অবগাহন করেছিল তার গুজরাটের মহারানীরূপে অতীতের ব্যথাতুর জীবনের স্মৃতিতে। তার সেই স্মৃতির রেশ সাতদিনেও কাটল না আমার। সেই সময় একদিন এক ঘটনা ঘটল আমার নিজস্ব ঘরের সামনে। আমার পরিচারিকার সাড়াশব্দ কিছুক্ষণ না পেয়ে সেদিন আমি ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াতেই এক যুবকের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার উপক্রম। সে দ্রুত সেই সময় ওখান দিয়ে অন্য কোথাও যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি নিজের গতিকে সামলে নিয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর আমার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। আমি অস্বস্তি অনুভব করি। তার ভাবখানা, সে যেন জীবনে এই প্রথম একজন নব-যৌবনাকে দেখল। অথচ বোঝাই যাচ্ছে, হারেমে এর অবাধ গতি, যা খুবই অস্বাভাবিক। নিশ্চয় প্রভাব হয়েছে। সুপুরুষ যখন, হতেই পারে। কিন্তু এভাবে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকার কোনো অর্থ নেই। সেই সময় আমার বাঁদী ছুটতে ছুটতে আসে। তাব ওপর আমাব খুব রাগ হয। আমি ভেতরে গিয়ে বসি।

পরিচারিকা বুঝতে পেরেছিল তার অন্যায় হয়েছে। আমার মুখের অভিব্যক্তিতে

বিরক্তি আর অসন্তোষ প্রকাশ পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। সে আমার কাছে বারবার মাফ্ চায়।

আমি বলি—এমন যেন কখনও না হয়।

—আর হবে না।

—ভুলে যেও না আমি এখানকার বেগম নই।

—আমি জানি।

—বেগম মহলে পুরুষ ঘুরে বেড়ায় কেন? ও কি খোজা?

বাঁদীর মুখে আতঙ্ক ফুটে ওঠে। বলে—না না, উনি খিজির খাঁ। সুলতানের বড় ছেলে।

—তাই বলে বেগম মহলে?

—উনি মাঝে মাঝে মাল্কা-ই-জাহানের কাছে আসেন। তাঁরই বড় ছেলে তো উনি। সুলতান আলাউদ্দিনের পরে উনিই হবেন সুলতান। সবাই জানে।

—ও। তাহলে তো স্বেচ্ছাচারী হবেই।

—না, না। উনি তেমন নন। উনি গান-বাজনা ভালবাসেন। একেবারে অন্যরকম। মাল্কা-ই-জাহানের ভাই এর মেয়ের সঙ্গে ওঁর সাদি হয়েছে।

—সেই বেগম কোথায় থাকেন?

- সুলতানজাদার আলাদা বেগমমহল আছে।

—ওঁর কয়জন বেগম?

—ওই একজনই। এই তো সেদিন সাদি হল খুব ধুমধাম করে।

আমার মনে হল বাঁদীর সঙ্গে এইসব আলোচনা করা ঠিক হবে না। সে প্রশ্রয় পেয়ে যাবে। মা নিশ্চয় জানে সব। তার কাছ থেকে জেনে নেব।

বাঁদী বাইরে চলে যায়।

কিন্তু সুলতানজাদার মুখখানা মাঝে মাঝে আমার মনের মধ্যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এসে যায়। না, ঠিক মুখ নয় তার চোখের ওই দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিতে কী যেন ছিল যা আমি এই প্রথম দেখলাম। তার মধ্যে তন্ময়তা অবশ্যই ছিল। তবে তন্ময়তা আমি অনেক দেখেছি। কিন্তু ওর চোখে তন্ময়তা ছাড়াও আরও কিছু ছিল, যা আমি আগে কখনও দেখিনি। আমাকে এই চিন্তা স্বস্তি দিতে চায় না। মনের মধ্যে অনেক সব প্রশ্নের উদয় হয়, যার সদুত্তর পাওয়ার জন্য আমি অস্থির হয়ে উঠি। একবার ভাবি বাঁদীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু তাতে নিজেকে অনেক নিচে নামিয়ে আনতে হয়।

পরদিন দুপুরেই আমি মায়ের কাছে ছুটি। মা আমাকে দেখে সন্তুষ্টির হাসি হেসে বলে—একা ভাল লাগছিল না?

—না।

—ভালই করেছিস। মেয়ে মায়ের কাছে আসবে না তো কোথায় যাবে?

—সব মেয়ের কি এই ভাগ্য হয়? দেবগিরির রাজকন্যার কি মায়ের কাছে যেতে

ইচ্ছা হয় না? তোমারও কি সেই দিনে হারেমের পথে পা বাড়নোর আগে মায়ের কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছা হয়নি?

মায়ের মুখ থমথমে হয়ে ওঠে। সে ওড়না দিয়ে নিজের চোখদুটো চেপে ধরে।

—আমি তোমাকে আঘাত করার জন্য একথা বলিনি মা।

মা নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—জানি। সেদিন সত্যিই আমার মন ছুটে গিয়েছিল মা আর বাবার কাছে। কিন্তু উপায় তো ছিল না।

—আজ আমি একটা প্রশ্ন নিয়ে এসেছি।

—প্রশ্ন? কিসের প্রশ্ন?

আমি তখন মাকে গতকালের ঘটনার কথা বললাম।

—ওর অবাধ গতি। মাল্‌কা-ই-জাহানের কাছে মাঝে মাঝে আসে।

—শুনলাম, ওর ভাই এর মেয়ের সঙ্গে সাদি হয়েছে?

—হ্যাঁ, জোর করে সাদি দিল। নিজের ভাই-এর প্রতিপত্তি বাড়াতে এমন করল। ছেলেটির একটুও ইচ্ছা ছিল না।

—কেন? মেয়ে কি দেখতে কুৎসিত?

—কুৎসিত নয়, তবে সুন্দরীও বলা যায় না। তা ছাড়া কারও নিজের পছন্দ অপছন্দও তো থাকে। ওর মায়ের উদ্দেশ্য হল ভাই-এর মেয়ের মাল্‌কা-ই-জাহান হওয়ার রাস্তাটা পাকাপাকি করে রাখা। কী ধুমধাম হল। দেবগিরির বৃদ্ধ মহারাজও এসেছিলেন। মেয়ের সঙ্গে দেখা করে গিয়েছেন। সুলতান দেবগিরিব মহারাজকে খাতির করেন।

—কিন্তু তাঁর ছেলেকে করেন না।

—সেকথা তো তুমি নিজের কানে শুনলে।

—সুলতানজাদা আমার দিকে কেমন করে যেন তাকাচ্ছিল।

মা হেসে বলে—স্বাভাবিক। তোর রূপে মুগ্ধ না হয়ে পারে?

—শুধু কি মুগ্ধ?

—তবে?

—আমি ঠিক জানি না।

—তুই যা ভাবছিস, তা নয়। ও একটু অন্যধরনের। নারীকে ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করতে যন্ত্র হিসাবে দেখে বলে মনে হয় না।

আমিও মাকে সেকথা বলতে চাইনি। তবু নিরুত্তর থাকি। যা জানতে চেয়েছিলাম তার চেয়ে বেশি জেনে গিয়েছি। কিন্তু সমস্যার কোনও সমাধান হল না। বরং আরও জটিল হয়ে উঠল।

—ওদের তো অনেক বেগম থাকে।

—হ্যাঁ থাকে। দিল্লির সুলতান হলে তো কথাই নেই। এক একজন আমীরেরই আট-দশজন করে থাকে অনেক সময়।

—তারা ভালবাসা পাওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে আসে না নিশ্চয়।

—কখনওই না। তারা ভোগ বিলাসকে পছন্দ করে বেশি। তাদের অধিকাংশ ভালবাসা কাকে বলে জানেই না।

—তাই কখনও হয়? মানুষ ভাল না বেসে থাকতে পারে?

—তুই যে ভালবাসার কথা বলছিস, সেই ভাল না বেসেও থাকা যায়। যেমন আমি।

—তুমি বাবাকে প্রথমে ভালবাসতে চাওনি?

—সত্যি কথা বলতে গেলে, ভুলে গিয়েছি। হয়ত চেয়েছিলাম।

—আমি জানি, ঠিক চেয়েছিলে। তারপর সেই ভালবাসার উৎস শুকিয়ে গেল একদিন। এর ফলে তোমার মনের একটা দিক অপূর্ণই থেকে গিয়েছে। এখন সেই অনুভূতিটাও নেই। বাবার ওপর তোমার যদি বিন্দুমাত্র ভালবাসাও অবশিষ্ট থাকত তাহলে বাবা যখন আমাকে বুকে তুলে নিয়েছিল সেই ভয়ঙ্কর রাতে তুমি নিজের বুকে নিজেই ছুরি বসিয়ে দিতে, প্রতিশোধস্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে হারেমের দিকে পা বাড়াতে না।

মা কেমন স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। আমি নিষ্পলক দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চেয়ে থাকি। বসে থাকতে থাকতে অনেক সময় চলে যায়, তবু মায়ের সাড়া শব্দ নেই। মাকে আস্তে করে ডাকি। সাডা নেই।

আমার ভয় হয়? একটু জোরে ডাকি—মা।

তবু সাড়া নেই।

আমি রীতিমতো ভয় পেয়ে দুহাত এগিয়ে গিয়ে মাকে ধবে ঝাঁকি দিয়ে ডাকি—মা।

মায়ের যেন ঘুম ভাঙে। আমাব দিকে চেয়ে বলে—ডাকছিস কেন? কী হয়েছে?

—তুমি চুপ করে আছ কেন? কত ডাকছি।

—শুনিনি তো? বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

—বসে বসে?

—তাই তো। কী বলছিস?

বুঝলাম মায়ের চেতনা ছিল না। বোধহয় বেশি মাত্রায় আঘাত পেয়েছে আমার কথায়। আমি দিনের পর দিন রূঢ় হয়ে উঠছি। ভাল লক্ষণ নয। আমি কি পাগল হয়ে যাব?

—মা, আমি কি পাগল হয়ে যেতে পারি?

তাড়াতাড়ি আমাকে জড়িয়ে ধরে মা বলে—পাগল হতে যাবি কেন? তোকে আমি সব কিছু থেকে বাঁচাব। কাব সাধ্য তোর অনিষ্ট করবে? যে অনিষ্ট করতে পারত তাব কাছ থেকে শুধু শুধু ছিনিযে আনিনি।

মায়ের তাই বিশ্বাস। বাবারও এক ধরনের বিশ্বাস ছিল। মা জেদের বশে নিজের সতীত্ব বিসর্জন দিয়েছে। বাবার তো চরিত্র বলে কিছুই ছিল না। কে যে আমায় কত ভাল কবত বুঝতে পারি না। হারেমে আমি একবার ঢুকে কিভাবে সতীসাবিত্রী হয়ে উঠব তাও বুঝি না।

—আমি এবাবে আসি মা। তুমি বিশ্রাম কর।

—কিন্তু তুই। কী বলতে এসেছিলি?

—শুনলাম তো খিদির খাঁ সম্বন্ধে।

—হ্যাঁ। ছেলেটা ভাল। অন্য সব সুলতানজাদার মতো নয়। নাচ গান ভালবাসে। ও জোর করে তোর কোন ক্ষতি করবে না। কিন্তু অন্যদের বেলায় খুব সাবধানে থাকবি।

—আচ্ছা। এবারে আসি। তুমি একটু শুয়ে থাক।

নিজের ঘরে এসে মায়ের জন্য চিন্তা হয়। ওভাবে তাকে বলে অনুতাপ হল। আর কখনও মাকে কিছু বলব না। হয়ত আমাকে আর একবার দেখার বাসনায় মা নিজেকে যেভাবে হোক বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল।

মানুষের চিন্তাশক্তির সীমা থাকে নিশ্চয়। নইলে পাগল হয়ে যেত। চিন্তার কি শেষ আছে? মায়ের জন্য চিন্তা, নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা, সতীমার জন্য চিন্তা। মনে হয়, এত চিন্তার চাপে মানুষ বোধহয় বোধশক্তি হারিয়ে ফেলে।

একটু পরে বাঁদী এসে ইতস্তত করে বলে—সুলতানজাদা ঘরের সামনে ঘোরাঘুরি করছিলেন।

—কে?

—সুলতানজাদা।

—সুলতানজাদা মানে?

—সেই কালকের—

—ঘোরাঘুরি করবেন কেন?

—তা জানি না। আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও করেননি।

—শোন। এই ধরনের কথা আমাকে কখনও বলবে না। যা বলার স্পষ্ট বলবে।

সে তাড়াতাড়ি আমাকে কুর্নিশ করে বাইরে গিয়ে নিজের জায়গায় বসে পড়ে। ওকে তিরস্কার করে বাইরে পাঠালেও, যা বলার ছিল বলে দিয়েছে। ও এটাও ধরতে পেরেছে যে ওর কথার অর্থ আমি ভালভাবেই বুঝতে পেরেছি।

আমি শয্যায় শুয়ে পড়ি। ভাবি হারেমের বেগমেরা এই জন্যই ধীরে ধীরে অলস হয়ে পড়ে। বাবার রাজ্যে আমি ঘোড়ায় চড়তাম অস্ত্র শিক্ষা করতাম। সঙ্গীদের সঙ্গে নির্জনে কোনও স্থানে ছোটাছুটি করতাম। উদ্যানে পুষ্প চয়ন করতাম। এখানে করার কিছু নেই। বেগমেরা এখানে প্রথম প্রথম এসে সুলতানের জন্য বোধহয় প্রতীক্ষা করত। তারপর নিরাশ হয়ে পরনিন্দা পরচর্চা করতে শুরু করত নিশ্চয়। তাদের মনে ঈর্ষার বীজের অঙ্কুরোদগম হয়। তারপর ধীরে ধীরে বৃক্ষ হয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে। তাদের কথার মধ্যে বন্যার স্রোতের মতো অশ্লীলতা ঢুকে পড়ে।

আমি ছটফট্ করি। কিসের যেন প্রতীক্ষা করছি। একটা কিছু ঘটে যাওয়ার প্রতীক্ষা। তারপরই নিজের কাছে ধরা পড়ে গিয়ে অবাক হই। আমি নিজের অজ্ঞাতে খিজির খাঁয়ের প্রতীক্ষা করছি। একটা নতুনত্বের স্বাদ। আমার রূপ তাকে কতখানি অভিভূত করেছে সেটি দেখে আস্বাদন করার সাধ। নিজেকে ভর্ৎসনা করি, ছি ছি দেবল, তোমার এই

অধঃপতন? একজন বিধর্মী, হোক সে ভাবী সুলতান, সে তো হিন্দু নয়। সে দেবদেবীর কথা জানে না, হিন্দুর আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে তার কোনও ধারণা নেই। সে নিষিদ্ধ মাংস খেয়ে বংশ পরম্পরায় অপবিত্র হয়ে রয়েছে। গঙ্গার পবিত্র জলধারায় স্নান করে, তার জল পান করেও কি তাকে পবিত্র করা সম্ভব হবে? হয়ত হবে কারণ গঙ্গাজলের তুলনা নেই। কিন্তু বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। কত বিধর্মীই তো গঙ্গায় গিয়ে স্নান করে অহরহ। হয়ত তারা মুহূর্তের জন্য পবিত্র হচ্ছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তারা অধর্মীয় কিছু করে ফেলছে কিংবা নিষিদ্ধ কিছু খেয়ে ফেলছে। কোনও লাভ হচ্ছে না। আর দেবল, তুমি তার চিন্তায় মশগুল হয়েছিলে? ছি ছি।

নিজে নিজেই একটু জোরে বলে উঠি—না না, আমি মশগুল হইনি। কখনওই নয়।

বাঁদী তাড়াতাড়ি ভেতরে এসে বলে—আপনি আমাকে কিছু বললেন বেগম সাহেবা?

—না। তুমি যাও।

আমাকে ও যেদিন 'বেগম সাহেবা' বলে সম্বোধন করেছিল সেদিন আমি আতঙ্ক গ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম সুলতান আলাউদ্দিন বুঝি আমাকেও বেগম করে নিচ্ছেন। পরে বুঝলাম বেগম মহলে এইভাবেই ডেকে ওরা অভ্যস্ত। আর কোথায় কীভাবে ডাকে আমি জানি না, জানার আগ্রহও নেই। কিন্তু আমি কখনওই মশগুল হইনি। গত কালের ঘটনায় নতুনত্ব ছিল। তার ওপর আজও সুলতানজাদা এসেছিল শুনে মনে নাড়া লেগেছে। কথায় কথায় মাযের কাছে গিয়ে তো তাকে উৎপাত করতে পারি না। আবার বাড়াবাড়ি কিছু হয়ে গেলেও তো মন কেমন হয়ে যায়। যাব কোথায়? আমি বড় অসহায় ঈশ্বর, আমাকে পথ দেখাও।

সেই রাতে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। বাবার রাজ্যে এক জঙ্গলাকীর্ণ পর্বত-কন্দর রয়েছে। সেখানে প্রশান্ত বদনে বুদ্ধদেব অধিষ্ঠিত রয়েছেন। কেউ জানে না এঁর সন্ধান। একজন শ্রমণ বাবাকে এসে বলে অনুরোধ করেছিলেন একথা যেন তাঁর বিশ্বস্ত কয়েক জনই শুধু জানে। এই মূর্তি শিব হয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমি তাঁকে দেখে বিস্মিত এবং বিমূঢ়।

—কী হল দেবল?

আমি তাঁকে প্রণাম করে বলি—আপনি তো ভগবান তথাগত। এখন দেখছি শিব।

তিনি একটু হেসে বলেন—যা ভাববে।

—প্রভু. এই পৃথিবীতে নিজেকে বড় অসহায় বলে মনে হয়। আমার কেউ নেই।

—কারও থাকে না। এখানে সবাই একা।

—আপনি যখন বলছেন, নিশ্চয় সত্য। কিন্তু সবার কত আনন্দ, সবাইকে দেখে মনে হয় সুখী।

—আনন্দ? সেটা তোমার নিজের ওপর নির্ভর করে। তবে সুখী কেউ নয়। কিছু কিছু নির্বোধ মানুষ নিজেকে সুখী বলে ভেবে নেয়। আর নিজেকে সুখী ভাবে আত্মসর্বস্ব ব্যক্তিরা। মনের মধ্যের ঈর্ষার জ্বালাকেও তারা সুখ বলে ভাবে।

—আমি কি সুখী হতে পারব কখনও?

—কোনও পুরুষ যদি নারীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে তাহলে অনেক নারীর কাছে তার চেয়ে সুখ নেই। সে ঐশ্বর্যকেও হেয় জ্ঞান করে।

—আমি সেই দলে।

—তুমি বোধহয় না বুঝে কথাটা বললে। এতে কিন্তু চরম দুঃখ, চরম দুর্দশাও ভোগ করতে হয়।

—আমার তাতে আপত্তি নেই।

—ভেবে বলছ তো?

—হ্যাঁ, প্রভু।

—তথাস্তু।

তিনি অদৃশ্য হন। আমরা আনন্দে আপ্লুত হই। স্বপ্ন ভাঙে ভোরের পাখির কিচির মিচির ডাকে।

এরপর কয়েকটা দিন ভালই কাটল। স্বপ্নে দেখা বুদ্ধদেব রূপী শিবের মূর্তি বারবার আমার চোখের সামনের ভেসে ওঠে। ভাবি, উনি আমাকে আশীর্বাদ করলেন ঠিকই, অথচ সুলতান আলাউদ্দিনের হারেমের এক অংশ বাস করে ভোরের সেই স্বপ্ন কীভাবে সফল হবে বুঝতে পারি না। এই সব চিন্তা মাথায় আসায় পরের রাতে ঘুমই এল না। সারারাত ছটফট্ করলাম। আমার বাঁদী বোধহয় বুঝতে পেরেছিল। দেখলাম সে কয়েকবার নিঃশব্দে এসে দেখে গেল। তার কর্তব্যপরায়ণতা আমাকে মুগ্ধ করল। রাতে অন্যান্য সব বাঁদীরা কক্ষের প্রবেশমুখে একটি খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমোয়। জেগে থাকলেও তারা নিঃসাড়ে পড়ে থাকে। বেগমেরা ডাকলেও উঠতে চায় না। তখন ধমক দিয়ে তুলতে হয়। পুরনো বাঁদীকে তাড়িয়ে নতুন বাঁদী আনার পক্ষপাতী সাধারণত কেউ নয়। কারণ তারা জানে পুরোনোকে তাড়ালে তারা বেগম মহলের দুর্বলতা আর কুকীর্তির কথা ঢাক পিটিয়ে প্রচার করবে। আমি বাঁদীর আন্তরিকতা দেখে মনস্থির করে ফেলি যে শিবের বর ফলে গেলেও এই বাঁদীকে সঙ্গে রাখব। এ আমার জীবনের সাক্ষী হয়ে থাকবে।

দুপুরে কোনওদিন আমি ঘুমোই না। কিন্তু সেদিন নিদ্রাহীন রজনী কাটিয়ে আমার তন্দ্রা এল। শয্যায় শুতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। সেই সময় স্বপ্ন দেখলাম। এই স্বপ্ন আগের স্বপ্নের মতো সুন্দর আর মধুর নয়। ঠিক তার বিপরীত। দুঃস্বপ্ন বললেও কম বলা হয়। আমি দেখলাম মায়ের কক্ষে প্রবেশ করেছি। আগের দিনের মতো ঘরের এককোণে মা বসে রয়েছে। একটু পরে একথা সেকথার পর আমি হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে উঠলাম। এখানে নিয়ে আসার জন্য মাকে তীব্রভাবে দোষারোপ করলাম। আমার এই কথা শুনে মায়ের সর্বাঙ্গ থরথর করে কেঁপে উঠল। তারপর একেবারে স্থির হয়ে গেল। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ছুটে গিয়ে তার গায়ে হাত দিয়ে দেখি মা পাষাণ হয়ে গিয়েছে। তার মুখ দেখতে

হুবহু সেই জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য গুহার বুদ্ধমূর্তির মতো। মুখে স্মিত হাসির আবছা আভাস। আমি সজোরে মাকে ঝাঁকি দিলাম। এক চুলও টলাতে পারলাম না। পাষাণের বুদ্ধমূর্তির মতোই ভারী বলে মনে হল। আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন মা আর নেই বুঝে আমি ডুকরে কেঁদে উঠলাম।

সেই কান্না শুনে আমার বাঁদী ছুটে এসেছিল। এসে, তার পক্ষে যা ঘোরতর অন্যায় তাই করে ফেলল সে। আমার শয্যায় বসে আমার গায়ে হাত দিয়ে বলে ওঠে—ভয় নেই বেগমসাহেবা, আপনি স্বপ্ন দেখছেন।

ততক্ষণে আমি নিজেই জেগে উঠেছিলাম। বাঁদীকে আমার শয্যায় বসে গায়ে হাত দিতেও দেখলাম। কিন্তু তার ব্যাকুল চাহনির মধ্যে সতীমায়ের চাহনির মিল খুঁজে পেয়ে ভর্ৎসনা না করে, এই প্রথম তার নাম ধরে ডেকে বলি—আমি ঠিক আছি আনোয়ারা।

ইতিমধ্যে তার হুঁশ হয়েছে কতখানি অন্যায় সে করে ফেলেছে। সে ছিটকে দূরে সরে গিয়ে বারবার আমাকে সেলাম জানিয়ে বলে—আমাকে আপনি মারুন, যে কোন শাস্তি আমাকে দিন বেগম সাহেবা।

—একথা বলছ কেন?

—আমি জানি আমার বেয়াদপি মাফ করা যায় না। কিন্তু কাল রাতে আপনি ঘুমোননি। বুঝলাম আপনার মনের মধ্যে একটা ঝড় উঠেছে। তাই কাছাকাছি থাকছিলাম।

—হ্যাঁ, তুমিও রাতে ঘুমোওনি।

—আপনি দেখে ফেলেছেন?

—রাতে না ঘুমোলে সবই দেখা যায়।

—আপনি আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না?

—কেন তাড়াব? তুমি আমার সঙ্গেই থাকবে। এমনকী, আমি যদি সুলতানের দেশ ছেড়ে অন্য কোনও দেশে চলে যাই, তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। তবে তুমি হয়ত নাও যেতে পার।

—আমি যাব। আপনার জন্যে মরতে পারি।

দেখলাম দুপুরে ঘুমের আর আশা নেই। না ঘুমোনোই ভাল। তাই আনোয়ারাকে প্রশ্ন করি আমার মনে হচ্ছে তুমি যেন একটা কিছু বলতে চাইছ কিন্তু বলতে পারছ না। সকাল থেকেই এটা লক্ষ্য করছি। কিছু বলতে চাও?

বাঁদী সঙ্কুচিত হয়। শেষে বলে—বলা অন্যায় হবে কি না বুঝতে পারছি না।

—বল।

—সুলতানজাদা আরও দুবার ঘুরে গিয়েছেন। প্রত্যেকবার অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেছেন।

—আমার কী করার আছে?

—আমিও তাই ভাবি। কিন্তু মনে হচ্ছে আমি বুঝি অপরাধী।

—তা কেন মনে হবে?

—প্রথমে অন্য বাঁদীরা আমাকে ঘিরে ধরে নানারকম প্রশ্ন করে। তারপর কয়েকজন বেগমসাহেরাও শুরু করেছেন। আমার কেউ নেই। সাদি দেওয়ারও কেউ ছিল না। তাহলে সাদি হয়ে যেত।

—তোমার বয়স তো বেশি নয়।

—তবু সাদি করার সাধ নেই আর। আমি একটু নিরাপদে থাকতে চাই।

—আমি যদি তোমার সাদি দিয়ে দি মাকে বলে?

বাঁদী কাতর স্বরে বলে ওঠে—আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না।

—তোমার নিজের সত্যিই সাধ নেই?

—না, আপনি বিশ্বাস করুন।

—ঠিক আছে যা বলছিলে তাই বল। তোমাকে সাদি করতে হবে না।

—বেগম সাহেবারা নানারকম কুৎসিত কথা বলছিল আপনাকে নিয়ে। আমার সহ্য হয় না। আপনি ছট্‌ফট্‌ করছিলেন যখন, আমি তখন কাঁদছিলাম। আমি কি করতে পারি বেগমসাহেবা?

—তোমাকে কিছু করতে হবে না। যা করার আমি করব।

—আপনি!

—হ্যাঁ। সুলতানজাদা যদি আবার ঘোরাঘুরি করেন তাহলে তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবে, তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান কি না। যদি তুমি তাঁর মধ্যে ব্যাকুলতা দেখ তাহলে বলবে জুম্মাবারে দুপুরে সবাই যখন ঘুমোয় তখন পেছনের ফুলবাগে আমার দেখা মিলবে।

আনোয়ারা চোখ দুটো বড় বড় করে বলে ওঠেন—আপনি ওখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন।

—হ্যাঁ, এখানে ঘোরাঘুরি করায় এত যখন ঠাট্টা-বিদ্রূপ হয়। তখন আমি নিজে তার সঙ্গে দেখা করে একটা ফয়সালা করে নিতে চাই।

—সুলতান আলাউদ্দিনের খুন ওঁর শরীরে বইছে বেগমসাহেবা। আমি যাব আপনার সঙ্গে?

—না। তুমি গেলে তোমার খোঁজ পড়বে।

—এটা কি ভাল হবে?

—এটাই আমার সিদ্ধান্ত আনোয়ারা।

সুলতানজাদার সঙ্গে সাক্ষাতের আগের দিন একবার ভাবলাম, মাকে সব কিছু খুলে বলি। কারণ মা এখানকার হালচাল ভাল জানে। আমি ভুল করছি কি না বুঝতে পারবে। তারপর ভাবলাম, আমি নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলব। আনোযারা আমাকে বলেছিল,

কথাটা শুনে সুলতানজাদার সারা মুখমণ্ডল আনন্দের হাসিতে ভরে উঠেছিল। সন্দিগ্ধ আনোয়ারাও সেই মুখের হাসিতে মতলব হাসিলের কোনও চিহ্ন খুঁজে পায়নি। তবু বলেছিল, অভিনয় বলে মনে না হলেও আমি যেন সাবধান থাকি। বাগানের রক্ষক একজন খোজা। লোকটা ভাল। কোন বিপদের উপক্রম হলে আমি যেন চেঁচিয়ে উঠি।

নিস্তব্ধ দুপুরে আমি রওনা দিলাম নির্দিষ্ট দিনে। নমাজ বেশ কিছুক্ষণ আগে শেষ হয়েছে। তাতে বেগমমহলের অবশ্য খুব বেশি তারতম্য হয় না। এই সময় বেগমদের বিশ্রামের সুযোগে বাঁদীরাও উধাও হয়। কেউ ঘুমোয়, কেউ কেউ হারেমের দুপা বাইরে কোন নোকরের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি আর হাত ধরে টানাটানি করে বলে শুনেছি। তাই আমি সবার অলক্ষ্যে ফুলবাগে গিয়ে পৌঁছলাম। কিন্তু সজাগ খোজার দৃষ্টি এড়াতে পারলাম না। অর্থাৎ সুলতানজাদা যদি আগে আসে সেও ওর দৃষ্টি এড়াতে পারবে না। ভালই হল। শুনেছি খোজাদের একটা গুণ, তারা সাধারণত বাঁদীদের মতো কথা চালাচালি করে না।

কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে জানি না। ভেতরে একটু এগিয়ে যেতেই দেখলাম একজন পুরুষ ছোট্ট বকুলতলায় শুয়ে রয়েছে। চমকে উঠলাম। এখানে তো শুধু বেগম মহলের আনাগোনা। বাইরের লোক ঢুকবে কী করে? আমি দাঁড়ালাম। আর না গিয়ে খোজার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম --ওখানে কে শুয়ে রয়েছে?

—সুলতানজাদা। চলে যেতে বলব?

—তোমার কোনও ক্ষতি হবে না?

—বোধহয় না।

—থাক! আমি দেখছি।

খিজির খাঁ এত তাড়াতাড়ি এসে গিয়েছে! ওর তর সইছিল না বোঝা যাচ্ছে। আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে ওর সামনে দাঁড়াই। ও শুয়ে শুয়ে আমাকে দেখে। তারপর চেয়েই থাকে আমার মুখের দিকে। ভাবলাম, মানুষটা পাগল নাকি।

বাধ্য হয়ে বলি—আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন?

ও ধড়মড়িয়ে উঠে বলে—হ্যাঁ, আমার ভুল হয়ে গিয়েছিল। ভাবছিলাম, স্বপ্ন দেখছি। কিছু মনে করো না। কিন্তু কোথায় তোমাকে বসতে দি।

—আমি এই ঘাসের ওপর বসতে পারি।

—না না, তাই কি হয়?

—আপনি তো শুয়েছিলেন।

—আমার কথা আলাদা। আমাদের যুদ্ধে যেতে হয়। বনে-জঙ্গলে ঘুরতে হয়।

—যুদ্ধে যান?

—কয়েকবার যেতে হয়েছে। ভালই লাগে। পায়ে অস্ত্রের চিহ্নও আছে। দেখবে?

—ওসব দেখাতে আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন?

—না না, তা কেন?

—তাহলে?

—আমি কী বলব ভেবে পাচ্ছি না, অনেক কিছু বলার আছে। মনে করতে পারছি না।

—তা হলে?

—আমি কী বলব, ভেবে পাচ্ছি না।

—তবে আজ থাক। ভেবে রাখবেন। অন্যদিন বলবেন।

সুলতানজাদার চোখে কাতরতা ফুটে ওঠে। ততক্ষণে আমার জানা হয়ে গিয়েছে যে এই তরুণটি আর যাই করুক অনিষ্ট করতে পারবে না। সে বলে ওঠে—তুমি আমাকে আর একটু সময় দাও দেবলরানী।

—আমার নাম জানেন?

—জানব না? যেদিন এলে সেইদিন থেকেই জানি। তোমাকে লুকিয়ে দেখেছি। সুলতান ছিলেন তো সামনে।

—এখনও লুকিয়ে দেখেন?

—না, আমার মনে হল সেভাবে দেখা ঠিক নয়। তাই তোমার ঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় আস্তে আস্তে যাই। সেদিন ওইভাবেই যাচ্ছিলাম বলে তোমার সঙ্গে ধাক্কা লাগেনি।

—আস্তে আস্তে কেন যান?

—তোমার গলার সুর শুনব বলে।

—আমি তো গান গাই না।

—তুমি জান না, তোমার গলার স্বরই সুর।

—আপনি আমাকে তুষ্ট করার জন্য এইসব কথা বলছেন।

সুলতানজাদা রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে—তুমি বিশ্বাস কর দেবলরানী। আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। আমি কীভাবে শপথ করলে তোমার বিশ্বাস হবে? ছুরি দিয়ে বুক চিরে রক্তাক্ত করলে বিশ্বাস করবে?

—সেটা তো ছেলেমানুষি।

—তা ঠিক। আজ প্রথম পরিচয় হল, আজই আমার কথা এতখানি বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু আর যে দেখা হবে না।

—কেন? শুনি, আপনি ভাবী সুলতান। আপনার সেই ক্ষমতা নেই?

—ক্ষমতা দেখিয়ে ভালবাসা আদায়? আমি ভাবতে পারি না। দুনিয়ায় এটা অসম্ভব। ক্ষমতা দেখিয়ে তোমাকে বেগম করে নিতে পারি। কিন্তু তাতে লাভ?

—আমার দেহের ওপর অধিকার।

—শুধু দেহ? মন নয়? এ তুমি কি বললে দেবলরানী, এতে তোমার তৃপ্তি হবে?

—সুলতানরা কি বেগমদের মনের খোঁজ রাখেন?

—আমি জানি না।

—আপনি ভালবাসার কথা বলছিলেন না?

—হ্যাঁ, আমি তোমায় ভালবাসি দেবল।

—পরিচয়ই হল না, এর মধ্যেই ভালবাসা? অদ্ভুত তো।

—তা জানি না। প্রথম যেদিন এলে সেইদিন থেকেই আমি বুঝে ফেললাম তুমি ছাড়া আমার জীবন বৃথা।

—তা ঠিক। নারীদেরও যেমন মন বলে একটা জিনিস আছে সেই খবর নেওয়ার প্রয়োজনবোধ করেন না আপনারা।

—হাজারবার করি। তুমি যাতে আমাকে ভালবাসতে পারো সেই চেষ্টা করে যাব। যদি না পারি জোর করব না কখনও। তোমাকে না হলে যে আমি বাঁচব না দেবল।

সুলতানজাদার কাতরতা, আর অকৃত্রিমতা আমাকে মুগ্ধ করে। আমি ভুলে গেলাম যে সে বিধর্মী, ভুলে গেলাম তার বাবা আমার বাবার রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছেন, মাকে নিজের হারেমে এনে তুলেছেন। ভুলে গেলাম বাবার আশ্রয়দাতা দেবগিরির অধীশ্বরের একমাত্র কন্যাকে জোর করে নিয়ে এসে নিজের বেগম করেছেন। সামনে এক সরল তরুণের অসহায় মুখ আমার হৃদয়ে দোলা লাগায়।

আমি বলি—আজ অনেকক্ষণ হয়ে গেল। এবারে আমাকে যেতে হবে। এমনিতেই অনেক কিছু কথা রটে গিয়েছে।

—কীভাবে আবার দেখা হবে?

—দুদিন পরে আমার বাঁদীকে জিজ্ঞাসা করে নেবেন।

—তাই হবে।

—আপনি আজ কখন এসেছিলেন?

—নাস্তা খেয়েই চলে এসেছিলাম। ভয় ছিল তুমি এসে যদি ফিরে যাও।

—এতক্ষণ না খেয়ে রয়েছেন? এখনি চলে যান।

—যাচ্ছি।

সুলতানজাদা অন্য একটি পথে রওনা হলেন।

ফুলবাগে যাওয়ার সময় সবার অলক্ষ্যে যেতে পারলেও ফিরে আসার সময় দেখি যে সদ্য ঘুম-ভাঙা চোখে দু'জন বাঁদী তাদের বেগমদের মহলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাকে দেখেই তারা তাড়াতাড়ি এক জায়গায় জড়ো হল। আমার বাঁদী দ্রুত আমার কাছে ছুটে এসে আমার মুখ চোখ, আমার পোশাকের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়। তার রকমসকম দেখে আমি বলি, ভেতরে চলো।

ভেতরে গিয়ে আমি বলি—কী দেখছ অত?

—আপনার কোনও ক্ষতি হয়নি তো?

—দেখে মনে হচ্ছে?

—না।

—তবে?

—এত দেরি হচ্ছিল। একবার ভেবেছিলাম নিজেই চলে যাব।

—খুব ভুল করতে।

—হ্যাঁ।

আনোয়ারা আর কিছু প্রশ্ন করতে সাহস পায় না। আমিও বলি না। তবে ও খুব উদ্বেগের মধ্যে ছিল সেটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। স্বাভাবিক। বিশেষত খিজির খাঁ ওরফে সামসুল হক যখন সুলতান আলাউদ্দিনের পুত্র। অপরাহ্ণের মধ্যে বাঁদী কয়েকবার ভেতরে ঢুকে কিছু বলব বলব বলে, না বলেই চলে গেল। একবার ইচ্ছা হয়েছিল, কারণটা জিজ্ঞাসা করি। কিছু বলেনি।

সন্ধ্যার পরেই মা আমার ঘরে এল। এই নিয়ে দ্বিতীয় দিন এল। খুবই স্বাভাবিক। বরাবর আমিই যাই তার কাছে।

আমি বলি—তোমার শরীর ভাল আছে মা?

– আমি ঠিকই আছি, তোমার কিছু হয়েছে কি?

—কী আবার হবে? যা হওয়ার অনেক আগেই হয়ে গিয়েছে।

—ওকথা জানতে চাইনি, সেটা তুমিও জান।

—বুঝেছি। বল, কী জানতে চাও।

—কোথায় গিয়েছিলে?

—এর মধ্যেই রটে গেল?

—এভাবে রটে, আগেও বলেছি তোমাকে।

—আমি গিয়েছিলাম পেছনের পুষ্পোদ্যানে, যেখানে হারেমের সবাই যায়! কোনও নিষেধ নেই তো।

—না। কিন্তু দুপুরে কেন! আর একা একা?

—হ্যাঁ, তাই গিয়েছিলাম।

—সেইজন্যেই রটে গিয়েছে। আমার কাছেও স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।

—সুলতানজাদা খিজির খাঁয়ের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে একটা গুঞ্জন শুরু হয়েছে তুমি জানো?

মা অবাক হয়ে বলে—না তো?

—অথচ তুমিই বল হারেমের হাজার চোখ-কান।

—কী হয়েছে?

—আমি সেদিন সুলতানজাদার সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার উপক্রমের পর থেকে তাব

ঘোরাঘুরি, বেগমদের হাসি, বাঁদীদের আমার বাঁদীকে ঘিরে ধরে বিদ্রূপ, সব কথা খুলে বলি।

—এতসব হয়েছে, অথচ আমি কিছু জানি না? ওরা ইচ্ছে করে আমার কাছে সব গোপন রেখে পরিণতির দিকে ব্যাকুল হয়ে চেয়ে রয়েছে। দেখতেও শুরু করেছে। আজকের ঘটনা তার প্রমাণ।

—আজকের ঘটনার কথা কেউ জানে না এখনও।

—না, জানলেও আমি অনুমান করছি খিজির খাঁয়ের সঙ্গে তুমি দেখা করতে গিয়েছিলে।

—ঠিক বলেছ। তাকে আমিই ওখানে যেতে বলেছিলাম।

—এতদূর!

—ওকে তুমি তো ভালই বল। আমি শুধু চেয়েছি হাসির পাত্র না হতে।

—বাকি রইল কোথায়? তুমি সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়ে এসেছ বলতে চাও?

—না। আমি চাই না সুলতানজাদা সব সময় আমার ঘরের সামনে ঘোরাঘুরি করুক।

—এবারে কী হবে?

—ও যদি নাছোড়বান্দা হয় তাহলে ওখানেই হয়ত আরও এক-আধবার দেখা করব। তারপর চুকিয়ে দেব।

মা শ্লেষের সঙ্গে বলে ওঠে—চুকিয়ে দেবে? যেন কত সহজ? তুই ভুলে গেলি দেবল যে তুই হিন্দুর মেয়ে? তোর বাবা রাজপুত?

—ওসব তুমিই শেষ করে দিয়েছ মা। তোমার জন্যই আজ আমি হারেম বাসিনী। আবার কেন?

—এত তাড়াতাড়ি মন এভাবে পালটে গেল?

—পালটে গেল কি না এখনও বুঝিনি। আমি শুধু ঠাট্টা বিদ্রূপ থেকে বাঁচতে চেয়েছি।

—ওকি ছাড়বে।

—ওকথা পরে ভেবো।

—তুই শেষপর্যন্ত বিধর্মী হবি?

—তুমি হয়েছ। দেবগিরির রাজকন্যা হয়েছেন। তিনি তো সদ্য আলাউদ্দিনের প্রৌঢ় বয়সের পুত্রের জননীও হয়েছেন। আমি যদি হই—

মা আমাকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠছিল। আমি তাড়াতাড়ি তার মুখ চেপে ধরি। আমার বাঁদী অত্যন্ত সজাগ। হয়ত শুনেও ফেলেছে।

—অমন করো না মা। আমাদের লজ্জার সীমা থাকবে না।

মা একটু সময় নিয়ে সংযত হয়ে বলে—আমি ভাবতে পারছি না।

—আমিও না। কিন্তু তুমি কি আমাকে উদ্ধার করতে পারবে? অন্তত কোন ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা বা রাজপুত্রের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে?

এবারে মায়ের মুখে অনিশ্চয়তার রেখা ফুটে ওঠে? তবু বলে—আমি অবশ্যই চেষ্টা করব।

—কতদিন?

—তা কি বলা সম্ভব?

—খিজির খাঁ ততদিন ধৈর্য ধরবে ভাবছ? ভুলে যেও না সবাই জানে সে ভাবী সুলতান।

—তুই দেখছি, ওর সঙ্গে একদিন দেখা করেই ওর দিকে ঝুঁকে পড়েছিস।

—আচ্ছা মা, তুমি কখনও কোনও পুরুষের মধ্যে তোমার প্রতি গভীর প্রেম ফুটে উঠতে দেখেছ?

—পুরুষদের ওসব থাকে নাকি?

মায়ের কথা শুনে, আমি স্তম্ভিত। কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে বলি—এটা কি তোমার মনের কথা?

—এর চেয়ে সত্যি কথা হতে পারে না।

—আমি সতীমায়ের মুখে তোমাদের গুজরাটের প্রধানমন্ত্রী মাধবের কথা শুনেছি। তিনি তাঁর স্ত্রীকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসতেন।

—ও রূপসুন্দরীর কথা বলেছে? সে তো অসামান্যা রূপসী ছিল। তোর চেয়েও। মাধবের নিশ্চয় ওটা প্রেম নয়; ওটা রূপসুন্দরীর দেহের প্রতি তীব্র আকর্ষণ।

—ছি মা। হারেমে থেকে থেকে তুমিও এদের মতো স্থূল মনের হয়ে উঠেছ।

—তোর বাবা কামের তাড়নায় রূপসুন্দরীকে লুকিয়ে রেখেছিল জানিস? তখন মাধব এসে আমার কাছেই কাতর প্রার্থনা জানায়। কিন্তু বাসন্তী এতসব জানল কী করে?

আমি হেসে বলি—হারেমের এক হাজার চোখ কান। রাজার অন্তঃপুরে অন্তত পাঁচ-দশটা চোখ কান রয়েছে। তাছাড়া সতীমা তো তোমার নিত্যসঙ্গী ছিল।

মা গম্ভীর হয়ে বলে—পুরুষদের প্রেম বলে কিছু নেই।

—তুমি সত্যিই অভাগিনী। তোমার জন্যে আমার কষ্ট হয়। এখন বুঝতে পারি বাবার সামান্য ভালবাসা পেলে তুমি গুজরাটের পতনের সময় আত্মঘাতিনী হতে। তার আগে বাবাকে জোর করে যুদ্ধে পাঠাতে আর আমার বুকে ছুরি বিঁধিয়ে হত্যা করতে।

মা আমার দিকে বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

—কী দেখছ?

—দেখছি, তুই এত অল্প কয়েকদিনের মধ্যে এত পরিণত হলি কী করে?

—এই হারেমের জন্য। এখানকার পরিবেশ চালচলন কথাবার্তা এখানকার বেগমদের কুটিল আর নীচ মন আমাকে এমন করেছে।

—মাত্র কিছুদিন হল তো এসেছিস। তখন কত সরল ছিলি, বেশি কথা বলতে পারতিস না। কী মিষ্টি ছিলি। এখন কত তাড়াতাড়ি অন্যরকম হয়ে যাচ্ছিস।

—তখন সদ্য ফেলে আসা সতীমায়ের প্রভাব ছিল আমার ওপর। তা ছাড়া আত্মরক্ষার তাগিদেই বোধহয় এমন হয়ে উঠেছি। এটা আমার স্বভাব নয়, জানি। কিন্তু আমি যদি প্রথম দিনের দেবলরানী থাকতাম তাহলে এর মধ্যেই শেষ হয়ে যেতাম।

—তুই কি খিজির খাঁকে পছন্দ করিস?

—ওর মধ্যে অপছন্দের পাইনি কিছু। কিন্তু এক দিনেই কি বলা যায়? পুরুষ সম্বন্ধে তোমার যা অভিজ্ঞতা তাতে আমাকে আরও সতর্ক হতে হবে।

—পুরুষেরা কিন্তু অসাধারণ অভিনয়ে পটু। চোখে এমন সব ভাব ফুটিয়ে তোলে যে মেয়েরা ভুলে মন দিয়ে ফেলে। রাজা করণ সিং বাঘেলারও এই গুণ ছিল। কিন্তু একবার প্রার্থিত নারীকে আয়ত্তে আনতে পারলেই একেবারে অন্যরূপ। পশুরাও কামার্ত হয়। কিন্তু তাদের চোখে মুখে বোধহয় কাম আর তীব্র লালসার কুৎসিত রূপ ফুটে ওঠে না। মেয়েরা এতই অন্ধ যে চোখে পড়ে না।

মায়ের এই ধরনের কথা আমি সহ্য করতে পারি না।

বলে উঠি—থামো মা, আর নয়। তোমার সম্বন্ধে সতীমায়ের মুখে শুনে যেটুকু শ্রদ্ধা রয়েছে তাকে নষ্ট হতে দিও না। হারেমের আর পাঁচটা বেগমের মতো হয়ে যেও না। তুমি ছাড়া আমার আব যে কেউ নেই মা। যে শ্রদ্ধাটুকু অটুট রয়েছে তাকে থাকতে দাও।

মা আর কিছু বলে না। আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বুকের মধ্যে এমনভাবে জড়িয়ে ধরে যেন কেউ তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে। এইভাবে কিছুক্ষণ থেকে আমাকে ছেড়ে দিয়ে কপালের ওপর একটা চুমু দিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে যায়।

বাঁদী ভেতরে ঢুকে আমাকে একবার দেখে নিয়ে আবার বাইরে চলে যায়।

আমাব বাবার ভূতপূর্ব রাজ্য গুজরাটের শাসনকর্তার নাম আল্‌প্‌ খাঁ। সুলতানের দরবারে তিনি শুনি সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি। মা বলে বেগম মাহরুর সহোদর বলে কথা। অন্য বেগমদের চোখ টাটায়। মাহরু অর্থাৎ মাল্‌কা-ই-জাহান শুনতে পাই সুলতান আলাউদ্দিনের জীবনের প্রথম নারী এবং সুলতানের পরবর্তীকালের কার্যকলাপ দেখে অবিশ্বাস্য বলে মনে হলেও সত্যিই এককালে তাঁর প্রিয়তমা ছিলেন। এখন দিন পালটেছে, বয়স হয়েছে। এখন সেদিনের প্রিয়তমা নিজের এবং পরিজনদের স্বার্থ ছাড়া অন্যকিছু চিন্তা করে না। সুলতানের মনেও মাহরুর স্থান বিশেষ নেই বলে সবাই বলে। তারপর তাঁর জীবনে কত নারী এল গেল। তবু মাহরু বেগমের আবদার বলেই সুলতান অনিচ্ছা সত্ত্বেও আল্‌প্‌ খাঁয়ের কন্যার সঙ্গে খিজির খাঁয়ের সাদিতে সম্মতি দিয়েছিলেন। মনে মনে তাঁর একটুও ইচ্ছা ছিল না। আমার মা বলল, খিজির খাঁয়ের ঘোর আপত্তি ছিল। কারণ আল্‌প্‌ খাঁয়ের কন্যা রূপসীর চৌহদ্দির মধ্যে পড়ে না। সুলতানজাদারও সুন্দরীকে সাদি করার ইচ্ছা। এই ইচ্ছার কথা তার দোস্তরা বলত। তবু মালকা-ই-জাহান জোর

করে তার সাদি দিয়েছিল। সেই থেকে তরুণ খিজির বিক্ষুব্ধ। ভাবী-সুলতান হিসাবে যে সব কর্তব্য করা উচিত সেইসব না করে কখনও সঙ্গীত কখনও নাচের আসর বসায়। জ্যেষ্ঠপুত্রের ওপর তার মায়ের খুব টান। সবাই বলে, আসলে সে সুলতান হলে নিজের প্রতিপত্তি যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তারই প্রচেষ্টা মাহরু এখন থেকে শুরু করেছে। তাই আল্প্ খাঁ দলে টানতে পুত্রের অপছন্দকে তোয়াক্কা করেনি।

কিন্তু খিজির খাঁ যতই নাচ-গান নিয়ে মেতে থাকুক মন তার বুভুক্ষু। নিজের হারেমে বেগমের কাছে যেতে ইচ্ছা করে না। ভবঘুরের মত ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কখনও অশ্বপৃষ্ঠে, কখনও শকটে, আবার কখনও পায়ে হেঁটে যা ভাবী সুলতানের পক্ষে কখনওই নিরাপদ নয়। সে ভুলে যায় মসনদের যে অধিকারী তার হাজার শত্রু। তার নিকট আত্মীয় এমনকী সহোদর ভাইরাও তার প্রাণ বিনাশের চক্রান্ত করতে পারে। যদিও তার ভাইরা প্রায় সবাই নাবালক, তবু তাদের সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে মিল ইতিমধ্যেই তাদের মুখে কৃত্রিমতা আর কুটিলতার যে হাসি ফুটে উঠেছে কৃত্রিম হাসিতেও তা ঢাকা পড়ে না। আনোয়ারা আমার সঙ্গে খিজিরের মেলামেশা দেখে একদিন একটা মন্তব্য করেছিল।

সামান্য বাঁদী হয়ে এই ধরনের মন্তব্য যে অমার্জনীয় অপরাধ একথা জানা সত্ত্বেও সে না বলে থাকতে পারেনি। বুঝতে পারি আমার মঙ্গলের দিকে চেয়ে সে বলে ফেলেছে। তাই বারবার যখন আমার কাছে মাফ্ চাইছিল তখন আমি গম্ভীর হয়ে বলেছিলাম—ঠিক আছে।

আনোয়ারার সঙ্গে একজন বৃদ্ধ আমীরের বাড়ির বাঁদীর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। সেই বাঁদী বহুদিন আমীরের বাড়িতে থেকে থেকে পরিবারের একজন হয়ে গিয়েছে। তার কাছে আমীরের বয়স্কা বেগম অনেক কথাই বলে। এমনকী একঘেয়েমি কাটাতে তাকে কাছে বসিয়ে গল্প করে। সেই বেগম একদিন কথায় কথায় বলেছিল, খিলজী বংশে খুন-খারাপি কখনো বন্ধ হবে না। মসনদ দখল নিয়ে হত্যা চলবে। শুনেই আনোয়ারার খিজিরের কথা মনে হয়েছিল। তার বুক কেঁপে উঠেছিল। সে বাঁদীর কাছে আরও জানতে চেয়েছিল। বাঁদী বলেছিল, সে আর বিশেষ কিছু জানে না। তবে আমীরের বেগম মন্তব্য করেছিল, খিজির খাঁয়ের মতো ভালমানুষকে দিল্লির মসনদে বসার উপযুক্ত বলে মনে হয় না। তা ছাড়া তার আগেই তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলা হবে।

শুনে আমার বুক কেঁপে ওঠে। আনোয়ারা বলে এসব জেনেই আপনাদের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠায় আমি থাকতে না পেরে বলে ফেলেছি।

আমার আজও মনে আছে ওর কথা শুনে আমি বেশ কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারিনি। তারপর শুধু বলেছিলাম—আমি ওকে ভালবাসি কি না জানি না। তবে তুমি যখন আমার কাছে আজীবন থাকতে চেয়েছ তখন বলি একজন গোটা মানুষকে ভালবাসলে তার রূপ, ধন, দৌলত পদবির গুরুত্ব থাকে না। তোমরা হয়ত বুঝবে না। কারণ তোমরা অন্যভাবে মানুষ হয়েছ।

এইসব কথাবার্তার কিছুদিন পরেই যেন বজ্রপাত ঘটল। সুলতানের বেগমেরা স্তম্ভিত। আমার মা কাঁদতে শুরু করে। আমি দিশাহারা মাল্‌কা-ইজাহান নিজের জ্যেষ্ঠপুত্রের মঙ্গলের জন্য সুলতানের কাছ থেকে একটি হুকুমনামা বের করে আনলেন। সেদিন আর কিছুই নয়, তিনি বুঝতে পারলেন আল্‌প্‌ খাঁয়ের কন্যার প্রতি তাঁর পুত্রের বিন্দুমাত্র দুর্বলতাও নেই। সে প্রকারান্তরে নিজের বেগমকে অমর্যাদা করছে। বেচারা নতুন বেগম শুধু চোখের জল ফেলে চলেছে। আল্‌প্‌ খাঁ নিজে এসে তাকে সকাতরে একথা বলেছে। এই সাদির পর থেকে গুজরাটের শাসনকার্য তার মাথায় উঠেছে। মাল্‌কা-ই-জাহান ক্ষিপ্ত হলেন। তিনি বারবার খিজিরকে বলেছিলেন আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে। খিজির খাঁ নিজে আমাকে বলেছে একথা। আমি বলেছিলাম, ওঁর হুকুম অমান্য করা বোধহয় উচিত হবে না। খিজির ম্লান হেসে আমাকে বলেছিল, তাই কখনও হয় দেবলরানী? আমি তাহলে বাঁচব নাকি?

অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বলা ওর কথা শুনে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চোখের পানে চেয়ে যে কথা ফুটে উঠতে দেখেছিলাম মনে হয়েছিল ওর মাথা আমার নিজের বুকের মধ্যে চেপে ধরি। কিন্তু ধরিনি। সেই প্রলোভন সামলে নিয়েছিলাম তখনকার মতো। মা বলেছিল, পুরুষেরা অভিনয়ে পটু। এই কি অভিনয়ের নমুনা? তাহলে সত্যি কি?

এইসব ঘটনার পরেই নিদারুণ হুকুমনামা। সুলতানের নির্দেশ যে আমাকে এই হারেম ছেড়ে দুই দিনের মধ্যে উঠে যেতে হবে 'কসুর-ই-লাল'এ। সঙ্গে অবশ্য সমবয়সী যাদের খুশি নিয়ে যেতে পারব। সেখানে বাইরের আর কারও প্রবেশের অধিকার থাকবে না। শুধু আমার মা যেতে পারবে। হারেমে আমার সমবয়সী অনেকেই আসে অন্যান্য বেগমদের সঙ্গে দেখা করতে। তারা হয়ত বেগমদের আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবদের কন্যা। তাদের মধ্যে অনেকে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ার চেষ্টা করেছে। আমি বিশেষ আগ্রহ দেখাইনি। এখন ভাবছি তাদের কয়েকজনকে দময়ন্তীর মতো সখী করে নিলে ভাল করতাম। এখন কাজে লাগত। তাই আমার সঙ্গে যাবে শুধু বাঁদী অর্থাৎ আনোয়ারা।

যাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মা আমাকে জড়িয়ে ধরে ক্রমাগত কেঁদে চলল। মাল্‌কা-ই-জাহান বিদায়ের সময় নিজে এসে উপস্থিত হল। হুকুমনামা যথাযথ কার্যকর করা হচ্ছে কি না দেখতে। মাকে কাঁদতে দেখে বিদ্রূপ করে বলে—আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে ভুগতেই হবে।

মা কোনও উত্তর দিল না। তার মুখ ঘৃণায় কুঞ্চিত হল মাত্র। অন্যান্য বেগমদের দলের মধ্যে থেকে একজন বলে—তোমাকে সবাই এমনিতে ঘৃণা করে, এখন সেটা বাড়ল শুধু।

—কে, কে বললি? সাহস থাকে তো বেরিয়ে আয়।

চিমনা বেগম নিশ্চিন্ত মুখে বেগমদের মধ্যে থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে প্রধান বেগমের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

—তুই বেয়াড়া, বজ্জাত। তোকে আমি শাস্তি দেব।

—দিও। এখন এই মেয়েটাকে শান্তিতে যেতে দাও তো।

—তোকে আমি এখান থেকে তাড়াব।

—পারবে না। এখন যাও।

মেঝেতে পা ঠুকে মাহ্রু চিৎকার করে ওঠে—খবর্দার।

—আচ্ছা থাকো। মাল্‌কা-ই-জাহান বলে কথা। সুলতানের যৌবনের প্রেয়সী।

সবাই স্তম্ভিত। চিমনা বেগম সহসা এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে খুব নীচু স্বরে বলে—দেরি করো না। আমি সব ব্যবস্থা করব। কী করব, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।

মাহ্রু বেগম চেঁচিয়ে ওঠে—অ্যাই ফিস্‌ফিস্‌ করে কী বলছিস?

—তোমার গর্দান নেওয়ার কথা।

ক্রোধোন্মত্ত মাহ্রুর নাচ দেখতে দেখতে আমি আনোয়ারাকে নিয়ে শকটে গিয়ে উঠলাম। মা আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। তার সকাতর দৃষ্টি সইতে না-পেরে আমি শকটের দরজা বন্ধ করে দিলাম।

আমার নতুন বাসস্থান কস্‌র-ই-লাল। সুন্দর প্রাসাদ। কিন্তু আমার কাছে মরুভূমি। মা নেই। খিজিরের সঙ্গে সাক্ষাতের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। এটাই আমার মর্মবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতদিনে বুঝতে পারলাম ওকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। ভুলে গিয়েছি, ও বিধর্মী। ভুলে গিয়েছি আমার বাবাকে গদিচ্যুত করে ওরই জন্মদাতা আমার মাকে বেগম মহলে নিয়ে এসেছে। খিজির তো এসব অপরাধে অপরাধী নয়। তাকে দেখলে মনে হয় অপাপবিদ্ধ। তার হৃদয় জুড়ে শুধু আমি।

এতদিন বেগমমহলে আনোয়ারা আমার সঙ্গে যেভাবে বাঁদীসুলভ ব্যবহার করত এখানে আসার পর থেকে আমাদের অজ্ঞাতে সেই ব্যবধান ধীরে ধীরে মুছে যেতে লাগল। দুজনার কেউই জানতে পারিনি আমরা পরস্পরের অতি ঘনিষ্ঠ এবং কাছের মানুষ হয়ে উঠছি। তবে আনোয়ারাকে প্রশংসা করতে হয় যে সে ব্যবধানটুকু কিছুতেই বিলুপ্ত হতে দেয় না। এতে ও আমার শ্রদ্ধা অর্জন করছে।

একদিন ও আমাকে বলে—আপনাকে অনেকদিন থেকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ভাবি। বাধো বাধো লাগে।

—কী এমন গোপন কথা যে এত দ্বিধা?

—এটা অহেতুক কৌতূহল।

—বল, সম্ভব হলে উত্তর দেব।

—আপনি বেগম মহল ছাড়ার মুহূর্তে চিমনা বেগম কানে কানে আপনাকে কী বলেছিলেন জানতে ইচ্ছে হয়।

—ঠিক কোন্ কথা বলেছিল মনে নেই। তবে আমাকে ঘাবড়ে যেতে মানা করেছিল। বলেছিল, সে এমন কিছু আমার জন্যে করবে যে আমি কল্পনাও করতে পারব না।

কথাটা শুনে আনোয়ারার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

—এতে আনন্দের কী আছে?

—উনি কখনও মিথ্যা স্তোকবাক্য বলেন না।

—কী করবেন? মাল্‌কা-ই-জাহানের শ্যেন-দৃষ্টি রয়েছে ভুলে যেও না। সবার ওপর রয়েছেন সুলতান।

—কিছু ভাববেন না।

সেইদিনই মা এসেছিল। আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে—আমি আর ওখানে থাকতে পারছি না দেবল। কিন্তু উপায় কী? নিজের স্বার্থের জন্য তোর এতবড় সর্বনাশ করলাম।

—যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে মা। এখন ওসব নিয়ে ভেবে কিছু হবে না। ভাগ্য যেদিকে টেনে নিয়ে যাবে সেইদিকেই যেতে হবে।

মা কপালে করাঘাত করতে করতে বলে—আমি আত্মহত্যা করব।

—তাতে আমার ভাগ্য ফিরবে না।

—তোর দুঃখ তো দেখতে হবে না।

—তুমি বড় স্বার্থপর।

—সে তো নতুন কথা নয়।

—ওসব পাগলামি ছাড়ো। মাঝে মাঝে এসে দেখা করে যেও, তাতেই আমার শান্তি।

ঠিক সেই সময়ে আনোয়ারা আমার বয়সী দুইজন মেয়েকে সঙ্গে করে হাসতে হাসতে এসে আমার কক্ষে উপস্থিত হয়। মা অবধি বিস্মিত হয়ে যায়। মা এদের দেখেছে, নামটা মনে করতে পারে না।

দুই তরুণীই আত্মপরিচয় দেয়। একজন ফতেমা অন্যজন আমিনা। দুটি নামই বিখ্যাত হলেও বহু-ব্যবহারে নাম দুইটির মিষ্টত্ব এতটুকুও হ্রাস পায়নি। দুজনার বাবাই বেশ প্রভাবশালী।

আমি আমার কৌতূহল দমন করতে না পেরে ওদের প্রশ্ন করি—তোমরা এখানে ঢুকলে কী করে?

ওরা বলে—চিমনা বেগম ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তিনি তোমার কথা উল্লেখ করে আমাদের বললেন যে তুমি সঙ্গীসাথীহীন অবস্থায় বড় একা রয়েছ। তাই পাঠিয়েছেন। আমরাও হারেমে তোমাকে দেখে তোমার সঙ্গে ভাব করার জন্যে পাগল ছিলাম। কিন্তু যা গম্ভীর দেখাত তোমাকে, মিশতে পারতাম না।

—আমার সঙ্গে ভাব করার ইচ্ছে কেন?

ফতেমা বলে—ইস্, জানো না যেন।

—সত্যিই জানি না।

আমিনা বলে—আরশিতে নিজের মুখ দেখেছ?

—তোমরা কি পুরুষ?

—রূপের আবার পুরুষ নারী আছে নাকি? ওসব কথা থাক। আমরা আসায় তুমি বিরক্ত হয়েছ?

—তোমরা আসায় আমি প্রাণ পেয়েছি। তোমাদের মতো কাউকে পাওয়ার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম।

ওরা দুজনে একসঙ্গে উঠে এসে আমাকে চুম্বন করে। আমি প্রতিবাদ না করায় ওরা ছাড়তেই চায় না।

মায়ের মুখ দেখে বুঝলাম বিরক্ত হচ্ছে। আমি ওদের বলি—প্রথম দিনেই আমাকে মেরে ফেলো না।

ওরা তাড়াতাড়ি আমাকে ছেড়ে দিয়ে হাসতে থাকে।

আমি বলি—আজ না হয় চিমনা বেগম ব্যবস্থা করে দিয়েছেন রোজ তো সম্ভব নয়?

আমিনা বলে—কোনও ভয় নেই। ঢালাও অনুমতি। এই দেখ সুলতানের পাকা হুকুম।

সে তার পোশাকের গোপন স্থান থেকে একটি জড়ানো ভারী কাগজ বের করে দেখায়।

আমার মা অবধি বিস্মিত হয়। বলে—তোর জন্যে আমার ভাবনা গেল। তুই ভালই থাকবি। তোরা গল্প কর, আমি আজ চলি।

—কালকে এসো।

—দেখি।

ওরা সেদিন বহুক্ষণ ধরে আমার সঙ্গে গল্প করল। প্রথম প্রথম বাধো বাধো লেগেছিল, তারপর কেটে গেল। অনেক সহজ হলাম আমরা। একটা জিনিস আমার খুব ভাল লাগল, ওরা কারও সম্বন্ধে কোনও কুৎসা রটাল না কিংবা পরনিন্দাও করল না। ওরা সত্যিই ভাল, অন্যান্য আমীর কন্যার মতো ওরা দাম্ভিক নয়। আনোয়ারাকে বাঁদী বলে তার সঙ্গে সেই ধরনের ব্যবহারও করল না। কথাবার্তাও মিষ্টি। দেখে মনে হল আমিনা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মেলে ধরতে পারল না প্রথম দিনে। সঙ্কোচ কাটেনি পুরোপুরি। বোঝা গেল প্রাণোচ্ছল স্বভাব ওর। পরের দিনই বাঁধ ভাঙবে। আর ফতেমা অনেকটা দময়ন্তীর মতো। অনেক পরিণত। প্রতিটি কথার মধ্যে যুক্তি রয়েছে। দময়ন্তীর মতো ও আমাকে পরামর্শ দিতে পারবে।

বাইরে শকট অপেক্ষা করছিল তখন থেকে। সন্ধ্যা প্রায় হয়ে আসে।

ফতেমা বলে—আজ উঠব।

আমিনা বলে— আর একটু থাকি না।

—না বেশি বাড়াবাড়ি করলে লোকের নজরে পড়ব। বাবার বিপক্ষের কোনও আমীর সুলতানের কানে তুলবেন। সুলতান উলটো-পালটা কথা শুনে রেগে যাবেন। হুকুমনামা কেড়ে নেবেন।

—চল্ চল্ তবে। দেরি করিস না। সুলতান কদিন আগেই বাবার ওপর একটু চটে গিয়েছিলেন।

—এই কথা তুই বাইরে বলে বেড়াচ্ছিস?

—কেন, বললে কী হল?

—তোর বাবার সম্বন্ধে আর একটা কিছু শুনলেই সুলতান তাঁর দফারফা করে দেবেন।

আমিনা চোখ কপালে তুলে বলে—তাই তো? কী হবে?

—একটু বুঝে সুঝে চলিস।

ওরা চলে গেলে আনোয়ারা বলে—খুব ভাল হয়েছে। এই হলেন চিমনা বেগম। যেমন কথা, তেমনি কাজ। তুলনা হয় না। সবার চেয়ে আলাদা।

অখণ্ড অবকাশ এখানে। ফতেমারা যতই আসুক প্রতিদিন তো আসতে পারে না। আনোয়ারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতারও একটা সীমারেখা রয়েছে, তাকে সখী করে নেওয়া যায় না। শুনেছি মায়ের পূর্ব পুরুষদের কেউ একজন বিখ্যাত চারণকবি ছিলেন রাজস্থানে। আমার যদি সেই প্রতিভা থাকত বেশ হত। পাতার পর পাতা লিখে যেতাম। সখীর দরকার হত না। কিন্তু কী লিখতাম? কার কীর্তি কাহিনী? আমার বাবার? চারণকবিরা শুনেছি যাঁর সম্বন্ধে লিখতেন তাঁর বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতাকে মূল ভিত্তি করেই লিখতেন। কিন্তু তাঁদের কল্পনায় সেই কাহিনী এমন এক পর্যায়ে চলে যেত যা লক্ষ লক্ষ রাজপুতানাবাসীর মনকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তুলত। কোনওদিন যদি দেবগিরির রাজপুত্র সিংহনা সুলতানের বাহিনীকে যুদ্ধে পর্যুদস্ত করতে পারে তাহলে তাকে আমি ভাল না বাসলেও সেই ধরনের কিছু লিখতে চেষ্টা করব। কারণ দেশপ্রেম যে অন্য জিনিস। বাগনাল বা নন্দারবার আমার বাবার পিতৃভূমি না হলেও আমি ওই ক্ষুদ্র রাজ্য এবং দেবগিরিকে জন্মভূমির মতোই ভালবাসি।

কারণে অকারণে আনোয়ারা প্রায় সময় আমার আশেপাশে ঘোরাফেরা করে। আমার কখন কী প্রয়োজন হবে ঠিক নেই। তা ছাড়া সে বোধহয় বুঝতে পারে, বেঁচে থাকতে হলে কারও সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন হয়। এই মহলে রান্না ইত্যাদির জন্য অন্য কাজের মানুষও রয়েছে। আনোয়ারা তাদের সঙ্গে খুশিমতো কথা বলতে পারে। আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। আমার যতটুকু কথাই হোক বলতে হয় একমাত্র আনোয়ারাকে। সে সেটা ভালই বোঝে। আর সত্যিই দিন দিন তার সঙ্গে কথা বলার মাত্রা বেড়ে চলেছে।

একদিন আমি বললাম—বুঝলে আনোয়ারা, ওরা দুজনে যেদিন না আসে সেদিন আমার দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

—এতো খুব স্বাভাবিক বেগমসাহেবা। আমি কিন্তু এখনও আর একটি চমকের অপেক্ষায় রয়েছি।

—কীসের চমক?

—আমার ধারণা চিমনা বেগম আপনার জন্যে দুজন সঙ্গিনীর ব্যবস্থা করেই থেমে যাবেন না।

—কী আর চমক দেবেন। এক হতে পারে কোনও একদিন নিজেই এসে উপস্থিত হবেন।

—সে তো আসবেনই। তা ছাড়াও—

—যেমন?

—আমি জানি না। হতে পারে হয়ত সুলতান স্বয়ং এখানে এসে আপনাকে আপনার নিজের দেশে ফিরিয়ে দিতে পারেন।

শুনে আমি হতাশ হই। দেশে কার কাছে যাব? আনোয়ারা তো জানে না সবকিছু। জানবেও না। সিংহনার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র দুর্বলতাও অবশিষ্ট নেই। একথা কতবার আর মনের মধ্যে আওড়াব। কিছুদিন আগেও দ্বিতীয় তেমন কেউ না থাকলে ভাবা যেত তার কথা। কিন্তু কেমন যেন হয়ে গিয়েছি। সব অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

অপরাহ্নে মা এল। মা তিনদিন পরে এল। অথচ আমি অন্যান্যবারের মতো তেমন উদ্বেলিত হয়ে উঠলাম না। আমি স্পষ্ট বুঝলাম, মা আমাকে এখন আর সেই আনন্দ দিতে পারে না যা মা চলে যাওয়ার পরেও আমার মনকে বেশ কিছুক্ষণ প্রফুল্ল রাখত। আবদ্ধ নিস্তরঙ্গ জলাশয়ে মা এসে যেন ছোট্ট এক টুকরো মাটির ঢিল নিক্ষেপ করে যায়। যার ফলে পরপর কয়েকটি অতিক্ষুদ্র বৃত্তের সৃষ্টি হয়েই পরক্ষণে আবার শান্ত হয়ে যায়।

কয়েকদিন পরে আনোয়ারার অনুমানই সত্য হল। স্বয়ং চিমনা বেগম এসে উপস্থিত হলেন। আমার খুব আনন্দ হল। আমি তাকে বারবার বললাম– আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ফতেমা আর আমিনা না এলে আমি যে কী করতাম জানি না। ওরা সত্যি ভাল।

চিমনা বেগম হেসে বলে—ভাল বলেই তো পাঠিয়েছি।

বেগম সুন্দরী নয় তেমন। অথচ তার হাসি দেখে মনে হয় এমন সুন্দর হাসি আমি জীবনে দেখিনি। এতই মধুর বলে মনে হয়।

—আমার জীবনটা হয়ত নিরর্থক হয়ে যাবে, কিন্তু আপনাকে আমি ভুলতে পারব না।

—কয়জন কতটুকু পেয়েছে তাদের জীবনে? হারেমে গিয়ে সুলতানের সব বেগমের কাছে গিয়ে একে একে জিজ্ঞাসা করে এসো তো? তোমার মা সুখী? তুমি জানো মোটেই নয়। আমার ধারণা তোমার জন্যে সে আত্মহত্যা করেনি। কারণ রাজপুত রমণীদের সম্বন্ধে আমার ধারণা তারা নারীত্বের অপমানের চেয়ে আত্মহত্যাকে শ্রেয় মনে করে। দেবগিরির রাজকন্যা সুখী? আদৌ নয়। সুলতানের পুত্র গর্ভে ধারণ করেও সে সুখী নয়। দেবগিরি যে কতখানি সমৃদ্ধশালী দেশ ছিল তুমি কল্পনা করতে পারবে না। সেই দেশের

কিশোরীকন্যাকে সুলতান লুঠ করে নিয়ে এল। সেই তুলনায় তোমার দুঃখ কতটুকু? আমার কথা না-ই বা শুনলে। তবু সুখকে খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করে যেতে হয় দেবলরানী। আমি তোমাকে পছন্দ করি বলে তোমাকে আনন্দ দিতে চাই। তোমার রূপের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যার প্রতি আমার মন টানে। তোমার রূপ মানুষকে দগ্ধ করে না। কিন্তু সে নিজে পোড়ে। তাই এখন থেকেই প্রস্তুত হও। তোমার রূপ হয়ত অমলিন থাকবে কিন্তু তোমার মন তোমার সব কিছু পুড়ে খাক হয়ে যেতে পারে। আমি যতদিন পারব তোমাকে সান্ত্বনা দিয়ে যাব। কতদিন পারব জানি না।

আমি চিমনা বেগমের হাত শক্ত করে জড়িয়ে ধরে থাকি। তিনিই যেন আমার জীবনের শেষ অবলম্বন। ফস্‌কে গেলে অতলতলে তলিয়ে যাব।

সে উঠে বলে—আমি আজ চলি। কারণ পাশের ঘরে একজনকে সঙ্গে করে এনেছি। সে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। তাকে পেয়ে তোমার বোধহয় ভাল লাগবে।

—কে?

—নিজে গিয়েই দেখ।

চিমনা বেগম চলে গেলে আনোযারা এসে বলে—ওই ঘরে কে একজন বসে রয়েছেন। বেগমসাহেবা এসেই তাঁকে বসিয়ে রেখে নিজের হাতে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে আমাকে বললেন—ওকে রেখে গেলাম দেবলরানীর সঙ্গে আলাপ করার জন্য। তুমি দেখবে দুজনে যেন নিরিবিলিতে কথা বলতে পারে। আমি জানি উনি আপনার ভাল চান। এবারে আপনি ও ঘরে যান, আমি অন্য দিকে যাচ্ছি।

আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকি। দেখতে পাই সামনে দাঁড়িয়ে খিজির খাঁ। আমার মনে হল আমি মূর্ছিত হব। একটা ওড়না পড়ে রয়েছে খিজিরের পায়ের কাছে। আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটতে চায় না। মুখে কোনও কথাও আসে না। খিজিরও দেখি এক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। বরাবর তার দৃষ্টিতে যা ফুটে ওঠে আজও তাই। আজ যেন কিছুদিনের অদর্শনের পরে সেই দৃষ্টির গভীরতা আর তন্ময়তা অনেকগুণ বেশি। আমার মনে হল ছুটে ওর বুকের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিই। কিন্তু স্বাভাবিক সংযম আমাকে বাধা দিল। খিজির পুরুষ। সে ছুটে আসতে পারত। সেটাই স্বাভাবিক হত। কিন্তু আমার মনে হল, সে এখনও আমার সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারেনি। বুঝতে পারেনি যে আমার হৃদয় তার কাছে বাঁধা পড়েছে। হ্যাঁ, তার একজন বেগম থাকা সত্ত্বেও।

সে বলে—দেবলরানী আমি কি অন্যায় করেছি?

—তোমার মন কী বলে?

—আমার মন? আমার মন কী বলে তা জানি না। তবে না এসে যে থাকতে পারছিলাম না। আমি মরে যাচ্ছিলাম।

—কেন?

--তোমাকে দেখতে পাই না বলে।

—কেন?

—তোমাকে না দেখলে আমি বাঁচব না দেবল।

—চিমনা বেগমকে বলেছিলে?

—না।

—তাহলে?

—আমি কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। তোমার শূন্য ঘরের সামনে ঘোরাফেরা করতাম অনেকবার। চিমনা বেগম দেখতে পেয়ে ডাকলেন একদিন। আমি গেলাম। তিনি জানতে চাইলেন তোমার ঘরের সামনে ঘোরাঘুরি করি কেন। আমি বললাম, সত্যি কথাই বললাম। বললাম, তুমি চলে যাওয়ায় আমার বাঁচার সাধ চলে গিয়েছে। উনি বললেন, তুমি যুদ্ধে এত পারদর্শী, সামান্য একটা প্রাচীর টপকাতে পার না? আমি বললাম, পারি। কিন্তু প্রহরী দেখে ফেললে তাকে যে খুন করতে হয়। উনি বললেন. ভালবাসায় খুনখারাপি হয়েই থাকে। ও কিছু নয়। অনেক ক্ষেত্রে নিজেকেও খুন হতে হয়। ওঁর কথা শুনে আমি খুব উৎসাহ পেলাম। বললাম, ঠিক আছে।

উনি বললেন—কী ঠিক আছে?

আমি বললাম—খুন হয় হোক। আমি যাব।

উনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন—দাঁড়াও. আমি একটু খোঁজ নি।

এরপর একদিন চিমনা বেগম এই মহলের সামনে দিয়ে যেতে যেতে দেখলেন কস্‌র-ই-লাল মহলের সামনের প্রহরী তাঁর খুব পরিচিত। তাকে বললেন, একদিন একজনকে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন, তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে হবে। সে সঙ্গে সঙ্গে রাজি। চিমনা বেগম একবার তাকে সুলতানের রোষানল থেকে বাঁচিয়েছিলেন।

আমি সংযত থাকতে পারলাম না। ছুটে গিয়ে তার মধ্যে মিশে যাই। কতক্ষণ সেইভাবে ছিলাম জানি না। কোনও কথা হয়নি ইতিমধ্যে। শুধু অনুভব। এরমধ্যে ধূলিঝড় উঠে নগরীকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে বুঝিনি কেউ। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে তাও জানি না।

বাইরে একসময় গলার ঘন ঘন কাশির আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি খিজিরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখি একটু দূরে আনোয়ারা সসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

—তুমি লুকিয়ে দেখছিলে নাকি?

—না। চিমনা বেগম মানা করে দিয়ে গিয়েছেন। বাইরে তুমুল ঝড়ে ঘরবাড়ি ভেঙেছে। কিছু লোক নিশ্চয় মরেছে।

—ঝড় হয়েছে? আমি তো—

—আপনার জন্যও আমার ভয় হচ্ছিল। কোনও ক্ষতি হয়নি তো?

আমি হেসে বলি—ক্ষতি? ক্ষতি আজকে হয়েছে নাকি। আগেই হয়েছে।

ওঁর কোনও শকট নেই দেখলাম। কাসেমকেও ছট্‌ফট্‌ করতে দেখলাম। ও নিশ্চয় জানে চিমনা বেগমের সঙ্গে তিনিও এসেছেন।

—জানে।

—উনি কী করে যাবেন? কোন আমীরের কন্যা?

আমি হেসে বলি—উনি নিজেই যাবেন।

এবারে দেখতে পেলাম আনোয়ারার মুখের দুশ্চিন্তা মুহূর্তে মিলিয়ে গিয়ে নির্মল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আসল সত্য তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমার ওপর ওর টান যে কত নির্ভেজাল এরকম প্রমাণ কতবার যে পেয়েছি তার ইয়ত্তা নেই।

পরদিন মা এল। এলে ভাল লাগে। মনের সব কথা একমাত্র তাকেই খুলে বলা যায়। তাই বলে খিজিরের কথা নয়। সেটা আপাতত আমার নিজস্ব হয়ে থাক। ফতেমা আর আমিনা কয়েকদিন আসেনি। ঘন ঘন আসা সম্ভবও নয় তাদের পক্ষে। তাদের নিজের জীবন রয়েছে, সখ রয়েছে, নানা জায়গায় যাওয়া-আসা রয়েছে। আমার কাছে ওদের আসতে ভাল লাগে বটে. তাই বলে প্রতিদিন এসে বসে থাকার মতো ভালবাসা নিশ্চয় নয়। আমি অবুঝ নই যে ওদের ওপর বিরূপ হব।

মা আমাকে কিছুক্ষণ আদর করল. এ কথা সেকথা বলল। তারপর হঠাৎ আমার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

—কী হল মা?

—কে এসেছিল?

আমার বুক কাঁপে। অবাক হয়ে ভাবি, বুঝলে কী করে? আসে তো সবাই নারী। মায়ের মুখের ভাব দেখে মনে হয় কোনও পুরুষালী ঘ্রাণ পেয়েছে আমার সর্বাঙ্গে। খিজিরের গায়ের সুগন্ধ কি আমার পোশাকে এখনো লেগে রয়েছে? না সেই পোশাক তো কালই ছেড়ে দিয়েছি।

—কী বলছ মা! দরজায় যে খোজা দাঁড়িয়ে রয়েছে তার চোখকে ফাঁকি দিয়ে ইঁদুর বেড়ালও ঢুকতে পারবে না।

—নিজের কলঙ্ক ঢাকার চেষ্টা কোরো না দেবল।

—তুমি আমার মধ্যে এমন কি দেখলে যাতে এইভাবে বলছ?

—তোমার ঠোঁটের পাশে চিহ্ন রয়েছে বাঁদী একথা বলে দেয়নি?

আমি রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম। আনোয়ারা তাই বারবার ওইভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। তার মুখে খুশি খুশি ভাব উপচে উঠছিল। মুখ ফুটে বলতে তো আর সাহস পায় না। ফতেমা আর আমিনা দেখলে বলে দিয়েই ক্ষান্ত হত না, হেসে লুটোপুটি খেত। মা এখানে বলে কয়েও আসে না। তাহলে হয়ত আনোয়ারাও একটা উপায় বাতলে দিত। খিজির বড় বেশি আদর করছিল। আমি ওকে থামাতে চেষ্টা করিনি। সাধ্যও ছিল না। থামাবার ইচ্ছা থাকলে তো সাধ হবে। তাছাড়া জানতাম না যে এমন হয়। আর হবে না। এবারে সাবধান হব। খিজিরের তো অভিজ্ঞতা রয়েছে। তার বেগম আছে। তার এমন হল কেন?

মা বলে—আজ আমার একদণ্ড থাকতে ইচ্ছে করছে না।

—এটা আমার ভাগ্য মা। তুমি তো জান, সেই কয়েকমাসের শিশুকে নিয়ে নিয়তি এমন এক নির্মম খেলা শুরু করেছে যার শেষ হবে কোথায় কেউ জানে না। আমি কী করব? তুমি পারনি, বাবা পারেনি, সতীমাও পারেনি। আমাকে দোষ দিচ্ছ কেন? এইভাবেই আমাকে শেষ হয়ে যেতে দাও এ জন্মের মতো। প্রার্থনা কর পরের জন্মে আমার মতো অলক্ষুণে মেয়ের জননী না হও।

মা আমাকে জড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদে। কান্নাটাই এখন দেখছি মায়ের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক দৃঢ়মনের নারীর পরিণতি বোধহয় এইরকমই হয়। কিন্তু এত কান্না আমার ভাল লাগে না। এর চেয়ে নিজেকে শেষ করে দেওয়া কত সহজ ছিল।

শান্ত হয়ে মা বলে—কী করে এল ও?

—খোজা প্রহরী চিমনা বেগমের বশীভূত।

—এখানেও চিমনা?

—হ্যাঁ সে আমাকে খুব স্নেহ করে।

—তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু মাল্‌কা-ই-জাহান? সে কি সহ্য করবে? তোকে শেষ করে দিতে পারে।

তাতে আমার এসে যায় না মা। মেরে ফেলবে? ফেলুক। কিন্তু খিজিরকে প্রত্যাখ্যান করার সাধ্য আমার নেই। তুমি বলবে, সে বিধর্মী। তার মধ্যে যা দেখেছি তাতে ধর্মের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। তুমি যদি বাবার বদলে এমন একজনকে পেতে তাহলে তোমার নারীজীবন সার্থক হয়ে যেত। ও আমার জন্য নিজের জীবন দিতে পারে। এটা কথার কথা নয়। ও তো হারেমে যায়। এই কদিন আমাকে না দেখে ওর চেহারা কেমন হয়েছে দেখলে বুঝতে পারতে।

মা হেসে বলে—ছেলেটা অভিনয়ে খুবই পটু দেখছি। ওর এত সব শুধু নিজের কামনা চরিতার্থতার জন্য। ওসব স্থায়ী নয়। ভুল করিস না দেবল। এখনও সময় আছে।

—তোমার দুর্ভাগ্য, তুমি তেমন পুরুষের দেখা পাওনি মা। রাজপুত রমণীরা জহরব্রত পালন করে। তাদের মধ্যে মনেপ্রাণে কতজন সতী আমি জানি না। আমার ধারণা অধিকাংশই বিধর্মীর কাছে নারীত্ব হারাবার ভয়ে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমি বলছি না আমার ধারণা সঠিক। তবে সৎ পুরুষের ভালবাসার সঙ্গে প্রকৃত সতীর তুলনা করা যায়।

—বড় বেশি উচ্ছ্বাস দেখাচ্ছিস। পুরুষের স্বভাবে ওসব নেই। বিধাতা তাদের সেভাবে তৈরি করেননি। সবাই তারা কম-বেশি ভ্রমর। ফুলে ফুলে বসে মধু খেয়ে বেড়ায়। ভ্রমর এক ফুলে বসে মধু খেয়ে জীবন কাটায় না। অত মধু কি থাকে?

—আমি আর কিছু বলব না মা। তুমি শুধু আশীর্বাদ কর, ওর যেন কোনও ক্ষতি না হয়। তাতেই আমার সুখ। আমার যা কপাল ভয় হয় এত সুখ সইবে তো?

খিজিরের সঙ্গে আরও দুবার দেখা হল। আর শেষের দিনের পরের দিনই প্রহরী কাসেম এসে অত্যন্ত ব্যথিত কণ্ঠে কুর্নিশ করে আমাকে বলে—বেগম সাহেবা, আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে।

ওর সঙ্গে আমি কখনও কথা বলিনি। দরকারও হয়নি। কিন্তু ওর কথা শুনে আমি প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম মনে। বললাম—কেন?

কাসেম খুবই বিচলিত কণ্ঠে বলে—বোধহয় জানাজানি হযে গিয়েছে। আমাকে দেবগিরির কাছে একটা কেল্লায় পাঠানো হচ্ছে। হয়ত গর্দানও নিতে পারে। এবারে চিমনা বেগম আমাকে আর বাঁচাতে পারবেন না। তাঁকে আমার আদাব জানাবেন। তাঁর মতো দিল কারও দেখিনি।

আমি বললাম—হতাশ হয়ো না কাসেম। আমি তোমার জন্য আমাব সাধ্যমতো চেষ্টা করছি।

কাসেমের মুখ দেখে মনে হল, সে আমার কথার এক বিন্দুও ভরসা পায়নি। সে জানে, যে নিজে এত অসহায় সে অন্যকে বাঁচাবে কী করে? কাসেম চলে যেতেই আমি আনোয়ারাকে ডেকে বললাম সব কথা। সে রীতিমতো ভেঙে পড়ল।

—তোমার এত বিচলিত হওয়া মানায় না। তুমি এখনই বেগম মহলে যাও। চিমনা বেগমকে গিয়ে সব কিছু খুলে বল। তিনি যেন কাসেমকে বাঁচান। আমার জন্যে কাসেমের ক্ষতি হোক আমি সইতে পারব না।

আনোয়ারা ছুটল। সেদিন সে ফিরেছিল রাত হয়ে গেলে। এসেই বলল—বেগম সাহেবা আমার মুখে একথা শুনে বললেন—তুমি যাও আমি দেখছি। মনে হয়, ওকে বাঁচাতে পারব। আমি গিয়ে বলে আসব।

পরদিনই দেখলাম নতুন প্রহরী মোতায়েন হয়েছে। একেও খোজা বলেই মনে হল। হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ। মুখ চোখেব ভাবভঙ্গি বড়ই নিষ্ঠুর। অনায়াসে একটার পব একটা খুন করে যেতে পারে। জল্লাদ ছিল কি না কে জানে? মাল্‌কা-ই-জাহানের নির্বাচন হতে পারে। নিজের গর্ভের সন্তানেরই যে শোচনীয় পরিণতি হতে পারে সে কথা ক্রোধের বশে ভুলে বসে আছে।

আনোয়ারা আমার আরও কিছুটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। কারণ আমিনা আর ফতেমার আসা কমে যাচ্ছে। দুজনাই বলে, মাল্‌কা-ই-জাহান পছন্দ করছেন না। তাদের মা বলেছে বেশি না আসা ভাল। তাদের বাবাদের ক্ষতি হতে পারে।

বেশ কয়েকমাস কেটে যায়। মন বুভুক্ষু, হয়ত দেহও। খিজিরের স্পর্শ আজও অনুভব করি। তাতেও তৃপ্তি। তার আতরে সাধারণত থাকে জুঁই কিংবা রজনীগন্ধার সুঘ্রাণ। অথচ হারেমের সবার এমনকী সুলতানেরও পছন্দ গোলাপ। খিজির কীভাবে যেন আমার পছন্দের কথা জানতে পারে। অথচ আমি তো মুখ ফুটে কখনও বলিনি। আতর মাখারও বিশেষ অভ্যাস ছিল না। আমার মাথার তেলে বরাবর চন্দনের সুবাস থাকত।

ফতেমা আর আমিনা এল একদিন। মুখ তাদের দুজনারই থমথমে। আমার উৎকণ্ঠা বাড়ল। খিজিরের কিছু হল নাকি?

ফতেমা বলে—আর কতদিন আসতে পারব বলতে পারছি না।

—কেন ফতেমা, তোমার বাবাকে অন্যত্র পাঠানো হচ্ছে?

—না, সেই সব কিছু নয়। মাল্‌কা-ই-জাহান নিজে একদিন আমাদের ডেকে নিয়ে বললেন—এখানে আমরা আসতে পারি কিন্তু ঘন ঘন নয়। তাই আসতে ভয় হয়।

আমিনা বলে—আর নতুন প্রহরীটা? দেখলে মনে হয় একটা খুনী। ওর দৃষ্টি আমাদের ওড়না ভেদ করে মুখে ঝলসে দেয় যেন।

এরপরই একথা সেকথার পর ফতেমা বলে ওঠে—খবর শুনেছ?

—কীসের খবর? কার কাছে পাব?

খিজির খাঁ খুব অসুস্থ।

শুনেই আমার বুকের মধ্যে ধক্ করে ওঠে। মাথা টলে যায়। কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলি—কী হয়েছে?

—কেউ বলতে পারছে না। উনি দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছেন। চিকিৎসার শেষ নেই। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। অসুস্থ সুলতান অবধি বিচলিত হয়ে উঠেছেন। হাজার দিনারী কী একটা বলতে যাচ্ছিল তাকে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছেন।

—হাজার দিনারী আবার কে?

—তাকেও চেন না? তুমি আছ কোথায়? গুজরাট থেকে সুলতান হাজার দিনার দিয়ে কিনে এনেছিলেন একদিন। সে-ই খোজাই এখন মাথায় চড়ে বসেছে। যুদ্ধ জানে বটে। দক্ষিণ দেশ থেকে রাশি রাশি জিনিসপত্র এনে ভরিয়ে দিয়েছে। সুলতান মহাখুশি। এখন সে তাঁর অত্যন্ত প্রিয় পাত্র। বিশ্বাসও করছেন তাকে অন্ধের মতো।

—ওর কথা শুনতে চাই না। সুলতানজাদার কী হল বল!

—সেটাই তো কেউ বুঝতে পারছে না। ভবিষ্যতের সুলতান বলে কথা। সুলতানের মেজাজ একটুও ভাল নেই।

আমার মনে হল এখনি ছুটে যাই সুলতানের হারেমে। সেখানে বেগম মাহ্‌রুর দুই হাঁটু চেপে ধরে প্রার্থনা জানাই একটিবার অন্তত তাকে দেখার অনুমতি দিতে। কিন্তু এতো শুধু অবাস্তব কল্পনা।

ফতেমারা চলে যাওয়ার সময় শুধু বললাম, তোমরা একটু বেশি করে এসো। আমি বড় একা।

—জানি দেবল। কিন্তু ভয় হয়। তবু চেষ্টা করব আমরা। আমরাও আসতে চাই। তোমাকে আমাদের ভাল লাগে। তুমি অন্যদের মতো নও।

ওরা চলে গেলে আমার ভেতরের আনচান ভাব বেড়ে যায়। এতক্ষণ ওরা ছিল বলে একটু অন্যমনস্ক হতে পেরেছিলাম? অস্থির হয়ে দাঁত দিয়ে ওড়নার প্রান্ত ছিঁড়ে

ফেলি। শেষে আমি আনোয়ারাকে ডাকি। আমার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ফুটে উঠছিল যার জন্য আনোয়ারা ছুটে এসে বলে—কী হয়েছে বেগম সাহেবা?

—আনোয়ারা সুলতানজাদা খুব অসুস্থ। কী করি এখন? বাঁচবে তো?

কথাটা শুনে আনোয়ারা কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বলে—আপনি শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। আমি এখনি গিয়ে খবর নিয়ে আসছি।

—কোথায় যাবে?

—সুলতানজাদা তাঁর বেগমকে নিয়ে থাকেন, নিজের হারেমে।

—নতুন খোজাটা রয়েছে। তুমি বাইরে যাবে কী করে?

—আপনার জন্য আমি সব করতে পারি। ও তো সামান্য একজন প্রহরী। নাম নাকি মুজির। বাহার আছে নামের।

—আর ওখানে গিয়ে?

—খুঁজলে আমার জানাশোনা বাঁদী এক আধজনকে নিশ্চয় পাব।

– কী করে যাবে?

—হেঁটে। অনেক দূর ঠিকই। কিন্তু আপনার গাড়ি নিলে সাড়া পড়ে যাবে। খোজাই রটিয়ে দেবে যে বাঁদী যাচ্ছে গাড়িতে।

জানলা দিয়ে দেখলাম প্রহরী ওকে আটকে দিল। কী যেন বলল বেশ উত্তেজিত হয়ে। আনোয়ারা আরও বেশি উত্তেজিত হয়ে তার জবাব দিল। প্রহরী সরে দাঁড়াল। আনোয়ারার এলেম আছে। ওর তীব্র বুদ্ধির পরিচয় হামেশা পাই। ওকে দেখতেও সুন্দর। বাঁদী না হয়ে বেগম হয়ে এলে খিলজী বংশের উন্নতিই হত। কিন্তু বেগম হতে হলে অসামান্য রূপ কিংবা নবাব বা আমীরের কন্যা হতে হবে। আনোয়ারা গরিব ঘরের মেয়ে। তাই সে বাঁদী।

ও চলে যাওয়ার পর দীর্ঘক্ষণ কেটে যায়। হঠাৎ কোথা থেকে মেঘ ছুটে এসে সব অন্ধকার করে দিল। তারপর তুমুল ঝড়। বৃষ্টিও হল কিছুটা। কিন্তু মেঘের গর্জনই বেশি। তারপর একসময় মেঘ কোথায় চলে গেল। উন্মত্ত গাছগুলো শান্ত হয়ে আবার আগের মতো দাঁড়িয়ে রইল মাথা দোলনা থামিয়ে।

আমি আরও অস্থির হয়ে উঠি। কী অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে আমার জীবনে। রাজধানী এসেই বন্দিনী। দেশে হলে একটা ঘোড়া বের করে নিয়ে তাতে চেপে ছুটতাম কোমরে একটা তরবারি বেঁধে। এখানে আমি পরমুখাপেক্ষী।

আনোয়ারা নিশ্চয় আটকে গিয়েছে। যত বুদ্ধিমতী হোক না কেন, ও নারী। এটা রাজস্থান নয়, মহারাষ্ট্রও নয়। তাই আমার আশঙ্কা বাড়ে। দিন অবসানের বিশেষ দেরিও নেই। এতক্ষণে নগরীর অন্য প্রান্ত থেকে দুবার ঘুরে আসা যায়? তবে কি ও কোন বিপদে পড়ল? আমি কষ্টের মধ্যে ছট্‌ফট্ করি। মনে হতে লাগল ছুটে বাইরে চলে যাই। শেষে শয্যায় শুয়ে কাঁদতে শুরু করি। বুঝতে পারি আমার মা শখ করে কথায় কথায় কাঁদে না।

শেষে বেশ রাত করে আনোয়ারা ফিরল। পাংশু মুখ। আমি প্রশ্ন করি—কী হল? কথা বলছ না কেন? খিজির ভাল আছে তো?

—না।

পৃথিবীটা যেন কেঁপে উঠল আমার পায়ের নীচে।

বলে উঠি—কেন? কি হয়েছে? অসুখটা কী?

—আপনি।

—আমি! কী বলছ তুমি?

—হ্যাঁ, আপনার জন্য সুলতানজাদার এই দশা। শুনে আমার খুব আনন্দ হয়েছে।

—আনন্দ হয়েছে? বলছ কী আনোয়ারা। মানুষটা শেষ হতে চলেছে আর তোমার আনন্দ হচ্ছে?

—এমন তরতাজা যুবকের মৃত্যু অত সহজে হয় না বেগমসাহেবা। এবারে সবার টনক নড়েছে। মাল্‌কা-ই-জাহানেরও। সুলতানজাদার বেগম তাঁর বাবা আল্‌প্‌ খাঁকে শুধু বলছেন, তাঁকে গুজরাটে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতে।

—লাভটা কী হল? খিজিরের কোনও উপকার হল?

—হবে। অবশ্যই হবে। শুধু আপনি একটু স্থির হয়ে থাকুন। এবারে সব ঠিক হবে। সুলতান সব শুনে মাল্‌কা-ই-জাহানকে কড়াভাবে বলেছেন যে আপনার সঙ্গে সুলতানজাদার শাদির ব্যবস্থা করতে। মাল্‌কা-ই-জাহান এখন অবধি রাজি হননি। কিন্তু হতেই হবে! ছেলের মঙ্গলেব কাছে সহোদরের সম্মান তুচ্ছ।

আনোয়ারার কথার সারমর্ম বুঝতে আমার একটু দেরি হল। তাবপর আমারও যেন ভাল লাগল। কিন্তু তার বেগমের কথা ভেবে বিবেক থেকে সায় পাই না।

এতদিন আনোয়ারা নিছক বাঁদী ছিল। ঝড়ের মধ্যে বেশি রাতে ওখান থেকে ঘুরে আসার পর থেকে যেন অভিভাবিকা হয়ে উঠল। বলল—কী ভাবছেন বেগমসাহেবা। এখনও কি একটু ভাল লাগছে না?

—আমার যে শুধু ওর বেগমের কথা মনে হচ্ছে।

—দুনিয়ার সবকিছুর কথা ভুলে যান। আপনার আর সুলতানজাদার কথা ভাবুন শুধু। জোর করে তাঁর অপছন্দের একজনের সঙ্গে শাদি দেওয়া হয়েছে। এতদিন ধরে তিনি কত যন্ত্রণা ভোগ করে আসছেন সেই কথা ভাবুন। আপনার যত দুঃখই থাকুক তাঁর মতো দিনে দিনে এত দুর্বল হযে পড়ে মরণের পথে পা বাড়াননি আপনি। আপনি কি তাঁকে বাঁচাতে চান না?

চিৎকার করে উঠি—বাঁচাতে চাই আনোয়ারা। ও না বাঁচলে আমিও বাঁচব না।

—তবে? তাছাড়া সুলতানদের হারেমে একাধিক বেগম থাকা সম্মানেরও বটে। তাতে বেগমেরা অভ্যস্ত। সুলতানদের মধ্যে নারীর প্রতি এই অনুরাগ, এ তো দুর্লভ। তা ছাড়া আপনার নিজের রূপের কথা ভাবুন। হারেমে এমন রূপসী একজন বেগম থাকা কি কম সৌভাগ্যের? সেই সঙ্গে এই ভালবাসা। এতো স্বর্গীয়। সুন্দরী হারেমে নিয়ে আসার

জন্য সুলতানেরা অন্যের দেশ আক্রমণ করেন। সুলতান আলাউদ্দিন করেননি? শ্রেষ্ঠা রূপসী পদ্মিনী পেতে তিনি একটু বেশি বয়সেই ছুটেছিলেন মেবারে। সেখানে অতদিন থেকেও ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হয়েছিল তাঁকে। আল্প্ খাঁয়ের কন্যার কথা ভুলে যান। সুলতানজাদার কথা ভাবুন আর সেইসাথে নিজের কথাও। সুলতানজাদার তো ভাগ্য ভাল। না চাইতেই বৃষ্টি। বিনা চেষ্টায় পদ্মিনী এসে অপেক্ষা করছেন তাঁর জন্য।

—পদ্মিনী? পদ্মিনী কোথায়?

—আপনি?

—কি যে বল আনোয়ারা। পদ্মিনীর খ্যাতি আমিও শুনেছি শৈশবে, সতীমায়ের কাছে। তাঁর ছিল ভুবন-ভোলানো রূপ।

আনোয়ারা হেসে বলে—আপনি নিজেকে জানেন না। আরশির সামনে দাঁড়াতেও চাননি বেশি। একবার দাঁড়িয়ে দেখুন। ঠিক আছে, কাল আমি আপনাকে সাজিয়ে দেব। তারপর দেখবেন নিজেকে।

ওর কথায় আমি না হেসে পারি না। আজ ওকে নতুন করে চিনছি। এত সুন্দর কথা বলতে পারে জানতাম না। আরও কত গুণ রয়েছে কে জানে। এ যেন দ্বিতীয় সতীমা। তবে আরও তেজী। বোধহয় কম বয়স বলে, আর জীবনে সতীমায়ের মতো আঘাত পায়নি বলে।

অবশেষে সত্যিই সেইদিনটি এল। আমি খিজিরের বেগম হলাম। ধূমধাম বিশেষ কিছু হল না। কারণ এটি অনেকটা মাহরু বেগমের পরাজয়বরণ। আনোয়ারা খবর সংগ্রহ করে এনেছে যে শেষ পর্যন্ত সুলতানের চেয়েও মাল্কা-ই-জাহান এই শাদির জন্য ব্যাকুল হয়ে হয়েছিলেন। কারণ খিজিরের তখন খুবই খারাপ অবস্থা। মাল্কা-ই-বেগম সুলতানকে উপযাজক হয়ে বলেছিলেন—দেবলকে বেগম না করলে খিজির বাঁচবে না। কমলা বেগমের অনুমতি নেওয়ার ব্যবস্থা কর।

সুলতান বলেন—সেই ব্যবস্থা আমি করছি। কিন্তু সেই মেয়েরও তো মতামত রয়েছে। তাকে লুঠ করে আনা হচ্ছে না।

—তার মত আছে। খুব বেশি রকম আছে।

সুলতান কৌতূহলান্বিত হয়ে প্রশ্ন করেন—কী করে বুঝলে?

—অনেকদিন আগে থেকেই আমি জানি। ও তখন ওর মায়ের কাছে এখানে থাকত। এমনিতেই আমি ওকে কস্র্-ই-লাল-এ পাঠাইনি। তখন তো তোমাকে বলেছিলাম। ভুলে গিয়েছ। তোমার বিশ্বাস না হলে ওকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করতে পারো।

সুলতান একটু হেসে বলেন—তোমার কথা এককালে খুব বিশ্বাস করতাম। এখন আদৌ করি না। তবে নিজের সন্তানের ভালর জন্য তুমি মিথ্যা বলবে না, এটুকু বিশ্বাস করা যায়। তুমি আয়োজন কর।

শাদির পরে দুজনে যখন দুজনকে কাছে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল তখন মাল্‌কা-ই-জাহানের কক্ষে আমার ডাক পড়ল। বেগম বাঁদী সবাই এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। তাই দেখে আমারও একটু ভয় হল। চোরা দৃষ্টিতে খিজিরের দিকে চাইলাম সে বিষণ্ণ, কিন্তু ঘাড় হেলিয়ে আমাকে যেতে ইশারা করে। বাঁদী ব্যস্ত হয়ে আমার পথ ছেড়ে দিল। আমি বেগমের কক্ষে ঢুকলাম। তাঁকে দেখে মনে হল আমার জন্য প্রস্তুত হয়েই রয়েছেন। আমাকে তাঁর দিকে এগিয়ে যেতে দেখেও তিনি একইভাবে বসে রইলেন। তাঁর দৃষ্টি আমার প্রতি নিবদ্ধ। নিষ্পলক চেয়ে থেকে তিনি তাঁর পাশেই বসতে বললেন। অত কাছে বসতে দ্বিধা হল। তিনি আমার হাত ধরে বললেন--বসো।

আমি বসলাম।

—তোমাকে কেন ডেকেছি জানো?

—না।

—তুমি রূপসী জানো?

—ছোটবেলা থেকে সবাই সেকথা বলে।

—তোমার গর্ব হয় না?

—না। অসুবিধা হয়।

—কিসের অসুবিধা।

—কেউ আমার নিজের কথা জানতে চেয়ে শুধু রূপের কথা বলে, তাই।

—অথচ ওই রূপে আমার ছেলেও মুগ্ধ হয়েছে। হওয়া স্বাভাবিক। আমি একটুও দোষ দিই না। সেইজন্য তোমাকে ওর বেগম করতে বাধ্য হলাম। নইলে ও বাঁচত না। তুমি জানতে সেকথা?

ভাবলাম বলি, শেষ মুহূর্তে জানতে পেরেছিলাম। কিন্তু আনোয়াবা বলেছিল, সব সময় সত্যি কথা বলা নিরাপদ নয় হারেমে। তাই বলি—আমি তো কস্‌ব-ই-লালে বন্দিনী ছিলাম।

—বন্দিনী? খিজির তোমার কাছে একবার গিয়েছিল না?

বুঝলাম, দ্বিতীয়বারের কথা ওঁর কানে যায়নি।

বললাম--হ্যাঁ গিয়েছিলেন। তাতে তো বন্দিত্ব ঘোচেনি।

—ফতেমোরা যেত।

—হ্যাঁ, মাঝে মাঝে যেত। ওদের কথা শুনে মনে হত ভয়ে ভয়ে এসেছে। তা ছাড়া আমাকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার কোনও ব্যবস্থা ছিল না।

—তুমি তো খুব কথা বল?

আমি নীরব ছিলাম।

—চুপ করলে কেন?

—আমি আগে কথা বলতে জানতাম না। এখানে এসে শিখেছি। বেগম সাহেবারা বলতেন, কথা বলা শিখে নাও। কেউ তোমার হয়ে কিছু বলবে না।

—তাই শিখেছ?

আমি নিরুত্তর থাকি।

—যাকগে তোমাকে কেন ডেকেছি শুনে নাও। তুমি খিজিরের বেগম হলে বটে, কিন্তু মাল্‌কা-ই-বেগম হবে আমার ভাই-এর মেয়ে। কারণ সে খিজিরের প্রথম বেগম। বুঝলে?

আমি ঘাড় কাত করি।

—মন খারাপ হল?

—না।

—একটুও না?

—না।

—সত্যি কথা বলছ?

—হ্যাঁ।

—ঠিক আছে, যাও। খিজির এখন তোমাকে সব সময় কাছে পাবে। ও সুস্থ হবে এইটুকুই আমার লাভ। তোমার সৌন্দর্যের প্রতি ওর মোহ হয়ত একদিন কেটে যাবে। পুরুষদের তো এখনো চেনো না। ধীরে ধীরে চিনবে। এখন যাও।

সেই রাত। কত ভাগ্যবিপর্যয়, কত বাধাবিপত্তি, কত উদ্বেগ আর বেদনা কত অশ্রুজলসিক্ত পিচ্ছিল পথে এল সেই রাত। একটি নির্জন কক্ষে শুধু খিজিব আর আমি। সেদিনের সেই রাতের প্রতিটি মুহূর্ত আজও ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে রয়েছে আমার মনে। সেইটুকুই তো আমার সম্বল। এই সম্বলটুকু নিয়ে আজও বেঁচে রয়েছি। নইলে তোমাদের কথায় সেই পরীর মতো দেখতে আমি কবে কেল্লা থেকে ঝাঁপ দিয়ে জীবনের যত জ্বালার নিবৃত্তি ঘটাতাম। তোমরা বল, আমার রূপ যথেষ্টই রয়েছে এখনও। বোরখা না ব্যবহার করা আমার পক্ষে আজও নাকি নিরাপদ নয়। কিন্তু দেখেছ তো কত অযত্ন আর অবহেলা করি নিজেকে।

কতবার ভেবেছি নিজেকে শেষ করে দিই। কিন্তু সেই রাতের কোনও এক মুহূর্তের কথা মনে পড়ে যায়। নিজেকে সামলে নি। ও যেন সামনে এসে বলে—না, না দেবল। তোমার জন্যেই আমি রয়েছি। কোথায় রয়েছে? তবে আমি জানি রয়েছে। মনে মনে বিশ্বাস করি সে রয়েছে। একটি জীবনেই মানুষ শেষ হয়ে যায় না। তোমবা বিশ্বাস করো কি না আমি জানি না। সতীমা বিশ্বাস করত। মা-ও করে। মানুষের বিশ্বাস তো সহজে যায় না।

হ্যাঁ, সেই রাত। এতদিন খিজিরকে জানতাম শান্ত বিষাদাক্রান্ত আমার জন্য অগাধ ভালবাসায় ভরপুর এক ফুটন্ত যুবক। সেই রাতে তাকে দেখে প্রথমে বেশ হতচকিত হলাম। সেদিন তাকে দেখলাম তেজী আরবী-ঘোড়া, দেহের প্রতি অঙ্গে যৌবন যেন নৃত্য করছে। ওর এই রূপ দেখে আমি মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম; ও আমাকে নিয়ে কী করবে

ভেবে পায় না। শুধু বলতে থাকে—আর কেউ তোমাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে নিতে পারবে না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তুমি আমার, শুধু আমার। আচ্ছা আমি বৃদ্ধ হয়ে গেলে তুমি আমাকে ভালবাসবে?

—এই মুহূর্তে এসব কী কথা?

—না, হঠাৎ মনে হল, তাই। জানি, তুমি আমাকে চিরকাল ভালবাসবে। আমার দেবল, শুধু আমার দেবল।

বলতে বলতে ও আমাকে শূন্যে তুলে নেয়, যেন আমি কোন ক্রীড়ার সামগ্রী। আমাকে নিয়ে ও একবার শিশুদের মতো দোলায়, একবাব বুকের মধ্যে নিযে আদর করে।

—ছাড় পড়ে যাব যে—

—আমার হাত থেকে? কখনও না।

প্রথম রাতের মিলন এই ধরনের হয় নাকি? মনে হয় না। বুঝলাম খিজিব একটা পাগল। তবে আমি খুব উপভোগ করি, প্রাণ দিয়ে উপভোগ করি। আমার মতো সুখী কে?

—জানো দেবল, আমার এই হাতদুটোয় প্রচণ্ড শক্তি। ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে তুলে নিয়ে দূরের ছোট্ট পাহাড়ের দিকে ছুটে যাই।

ঠিক আছে। যখন খুশি যেও। এখন একটু নিঃশ্বাস নিতে দাও, নইলে তোমার দেবল দমবন্ধ হয়ে মরে যাবে।

খিজির হঠাৎ থেমে যায়। আমার মুখের সামনে মুখ এনে উদ্বেগের সঙ্গে বলে—সত্যি?

—জানি না।

—বুঝেছি। তুমি মজা করছ।

আবার সে শুরু করে। সেই রাত যে কীভাবে কাটল বোঝাতে পারব না। নারীর জীবনের একটি রাত এভাবে পোহায় আমার ধারণা ছিল না। আমি ববং একটু অন্যরকম ভাবতাম। দময়ন্তীকে ছেড়ে আমি যখন চলে আসি তখন সে একজন সদ্য বিবাহিতাব এই রাতেব কথা আড়াল থেকে শুনেছিল। দুই সখীর মধ্যে আলাপ হচ্ছিল। সেই গল্পে এই বাধাহীন ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রাবল্য আদৌ ছিল না। তাদেব রাত শুরু হয়েছিল এক-আধ টুকরো মিষ্টি কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে। দময়ন্তী হুবহু বলেছিল আর হেসে গড়িয়ে পড়ছিল।

বরেব প্রথম কথা—তোমার নাম খুব মিষ্টি। সাবিত্রী।

বধূ নিরুত্তর।

—কে বেখেছিল?

—ঠাকুর্দা।

—আমার নাম জানো?

লাজুক কণ্ঠে—জানি।

—বল তো?

—বলতে নেই।

—আজকে শুধু বল। আর কোনওদিন বোলো না।

—অকল্যাণ হয়।

—স্বামীর কথা না শোনা পাপ।

—এইসব কথা না শুনলে চলে।

—কে বলল।

—দিদি।

—ও, দিদিকেও বুঝি এই কথা জিজ্ঞাসা করেছিল এই রাতে?

বধূ মুখ লুকিয়ে বলে—জানি না।

—তোমার চোখ দুটো খুব সুন্দর। একটু দেখি। আমার দিকে তাকাও তো।

—লজ্জা করছে।

—এখানে তো আর কেউ নেই।

—তোমাকে।

—আমাকে?

এরপর চুমুর আওয়াজ। বর চোখে চুমু খেয়েছিল। সদ্য বিবাহিতা তখন তার অনুভবের কথা বলেছিল। এরপর সারারাত ধরে ধীরে ধীরে সবই হল, কিন্তু পদ্মের পাপড়ি খোলার মতো একের পর এক। আমার শুনে বেশ ভাল লেগেছিল। ভাবতাম সিংহনার সঙ্গে বিয়ে হলে এইরকমই একটা কিছু ঘটত। কিন্তু আজ একি! প্রথম রাতেই ঝড়। সুলতানদের এই রকমটাই হয় নাকি। দময়ন্তীর গল্প কেমন যেন জোলো বলে মনে হতে থাকে। এটাই ভাল। অনেক ভাল, প্রতিদিন এইরকম ঝড় উঠুক।

আমাদের দুজনের দিন যেন স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে চলছিল। সেই সময় একদিন খিজিরের প্রথম বেগম ফিরে এল গুজরাট থেকে।

খিজির সুলতানের আদেশে বাইরে গিয়েছিল কোনও কাজে। ফিরে এসে বলে—সে এসেছে শুনলাম?

—কে?

—সে। আলপ্ খাঁয়ের মেয়ে।

—ছিঃ, ওভাবে বলতে নেই। সে তোমার প্রথম বেগম। তুমি সুলতান হলে সে হবে মালকা-ই জাহান।

—ওসব অনেক পরের কথা। আমার আবার ভাবনা বাড়ল।

—কিসের ভাবনা? সে তার নিজের জায়গায় ফিরে এসেছে। তার অধিকার রয়েছে।

—সব বুঝি। কিন্তু ওকে সহ্য করতে পারি না।

—কেন? ওর সম্বন্ধে কেউ তো খারাপ কিছু বলে না?

—তুমি বুঝবে না। ছেলেবেলা থেকেই ওকে আমার ভাল লাগে না। এমনিতে ঝগড়া করে না কখনও। কাউকে কড়া কথাও বলে না। কিন্তু তার জগতে মাত্র একজন মানুষ রয়েছে, সে হল ও নিজে।

—প্রায় সবাই এইরকম হয়।

—আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না। ওর মধ্যে উদারতা নেই। আমি এতটুকু বয়স থেকে ওকে দেখছি। সব কিছু নীরবে করে। তখন এক এক সময় মনে হত এর চেয়ে ঝগড়া-ঝাঁটি করা ভাল। এখনও একই রকম রয়েছে।

—একটু সহানুভূতির সঙ্গে ওকে দেখো, তাতে ওর আনন্দ হবে। তুমিও শান্তি পাবে।

—সহানুভূতির সঙ্গেই তো দেখে আসছি। মা নিজের জেদের বশে এই কাজ করেছে। কত কাকুতি-মিনতি করেছি, তুমি কল্পনা করতে পারবে না।

—ওসব থাক। ওকে শান্তিতে থাকতে দাও।

—আমি তো কিছু বলছি না। থাকুক। আমার দোস্তরা বলে, তোমাকে ও হিংসা করবে। একজন বলে ফেলে, তোমার ক্ষতিও করতে পারে।

- ওদের সবাই তোমার খাঁটি বন্ধু নয়। নিজের ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য তোমার তোষামোদ করে। তোমার মনে বিষ ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। তুমি সবার সব কথা বিশ্বাস করো না।

—সবই জানি। ওদের মধ্যে শুধু একজনই আমার আসল দোস্ত। তবে এক একটা কথা মনে বেশ আশঙ্কা জাগায়।

পরদিনই খিজিরের প্রথম বেগম আমাকে তার ঘরে যেতে অনুরোধ করে বাঁদীর মাধ্যমে। আমার ভালই লাগল তার আমন্ত্রণ পেয়ে। গেলাম ওর ঘরে। আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। আমার অস্বস্তি হয়। ও এবারে তাড়াতাড়ি উঠে এসে আমার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে পালঙ্কের ওপর বসতে দিয়ে নিজে পাশে বসে। আমার ভাল লাগে। ভাবি খিজির শুধু শুধু ওর ওপর বিরক্ত।

বেগম বলে—তোমাকে আমি আগে কখনও দেখিনি। তবে তোমার সম্বন্ধে অনেক শুনেছি। যা শুনেছি, তোমার রূপ তাকেও ছাপিয়ে যায়। বুঝি, যে কোনও পুরুষের পক্ষে এই প্রলোভন সামলানো সম্ভব নয়। তুমি ওকে ভালবাসো শুনেছি। তোমাদের ভালোবাসার পথে বাধা সৃষ্টি করে নিজের অশান্তি বাড়াব না। তবে আমার অধিকার আমি ছাড়ছি না। খিজির সুলতান হলে আমিই হব তার প্রধান বেগম।

আমি হেসে বলি—আমার কোনও দাবি নেই। শুধু ওপরওয়ালার কাছে প্রার্থনা জানাই, ও যেন সুস্থ থেকে দীর্ঘজীবী হয়। আর আমি যেন ওর কাছাকাছি থাকতে পারি।

খিজিরের প্রথম বেগম আর কিছু বলে না। মনে হল, তার বলার আর কিছুই নেই।

এমনকী, আমার সঙ্গে অন্য কোনও কথাও বলতে পারে না। আমি ওর ঘর থেকে চলে আসি।

শাদির দশদিন পরে মা এল। খিজির তখন রাজধানীর বাইরে থাকে। পরেও এইভাবে আসত মা। মা চাইত না খিজিরের অসুবিধা হোক। তাছাড়া মুখে না বললেও আমি জানি খিজিরকে ততটা পছন্দ করে না মা। মায়ের একটা মন্তব্যের কথা আমার মনে আছে। আমি তখন নতুন এসেছি। মা বলেছিল, সুলতানের বড় ছেলে মসনদে বসার উপযুক্ত নয়। যুদ্ধ খুব ভাল জানে বটে। কিন্তু একটা কিছু ধরে রাখার বা আদায় করার মানসিকতা ওর নেই। গানবাজনা, ফকির সাধুদের উপর্ ওর ঝোঁক।

সেই সময় এদের সম্বন্ধে আমার কোনও আগ্রহ ছিল না। বিধর্মীদের হারেমে আবদ্ধ থাকার জন্য মনে সব সময় বিতৃষ্ণা। মায়ের সঙ্গে ভাব হলেও, মনে মনে তাকে সম্পূর্ণ আপন করে নিতে পারিনি। সুলতানের কোন্ ছেলে অপদার্থ তাতে আমার কিছু এসে যেত না। মায়ের সেই মনোভাব আজও বোধহয় রয়ে গিয়েছে। যদিও মা খিজির সম্বন্ধে একবার বলেছিল, সে এমনিতে ভাল। ওর অনুপস্থিতিতে মা এসে ভালই করে।

আমাকে শাদির পর প্রথম দেখেই মায়ের চোখে আতঙ্ক ফুটে ওঠে। বলে—এ কি চেহারা হয়েছে তোর? দিন রাত্রির ধস্তাধস্তি করিস নাকি?

আমার ভীষণ লজ্জা হয়। তবু নিজেকে বাঁচাতে বলি—কেন, কী হয়েছে? আমার শরীর তো খারাপ হয়নি? তুমি যেভাবে বলছ কী যেন হয়ে গিয়েছে। বাঁদী রোজই দেখে, সে কিছু বলে না।

—সে আবার কী বলবে? সাহস আছে নাকি? তোকে সাবধান করে দিচ্ছি, এত অত্যাচারে রূপ থাকে না। তুই সংযত না হলে ওকে সামলাতে পারবি না। ছিবড়ে করে ফেলে রেখে দেবে।

—ওকে তুমি চেনো না মা। আর অন্তত একটি মাস দেখ।

—না দেখে আর উপায় কী।

মায়ের কণ্ঠস্বরে হতাশা। আমি গুরুত্ব দিই না। খিজিরের পাগলামোতে আমার যথেষ্ট আশকারা রয়েছে। ভাল না লাগলে কি শুধু শুধু ওকে আমি পাগলামো করতে দিই? মা-ও ঠিক বুঝেছে। তবু রূপ সম্বন্ধে সচেতন করে দিল। মায়ের কর্তব্য করল।

মা এবারে বলে—আমার মনে হয় বিপদের দিন ঘনিয়ে আসছে।

—কেন মা?

—সুলতান দিনের পর দিন বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ছেন।

—বয়স হচ্ছে।

—সেটা নয়। হাজারদিনারী খোজাটা সব সময় তাঁকে আগলে রাখে। তার ওপরে সুলতানের অন্ধ বিশ্বাস দিনে দিনে বেড়েই চলেছে।

—ওসব কথা ভেবে মন খারাপ করো না।

—কিছুই বুঝিস না। সুলতান রয়েছেন বলে সবাই আছে। তাঁর কিছু হলে কে কোথায় ছিট্‌কে পড়বে কোনও ঠিক নেই।

—কেন? খিজির হবে সুলতান আর আল্‌প্‌ খাঁয়ের মেয়ে হবে মাল্‌কা-ই-জাহান। সুলতানের ওপর আমার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই।

—কয়জনার বা রয়েছে? তবু নিজেদের ভবিষ্যৎ ভেবে সবাই তাঁর মঙ্গল কামনা করে। তেমন কিছু ঘটলে সুলতানের মহলেই খুনের স্রোত বয়ে যেতে পারে। খুব সাবধান দেবল। খিজিরকে সাবধানে থাকতে বলিস। সব দিকে যেন নজর রাখে।

—আমি পারব না। ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাবে। ও আমাকে নিয়ে কত স্বপ্ন দেখে। তোমাকে বলতে এখন আর লজ্জা নেই যে আমিও দেখি। আমার মুখে এইসব কথা শুনলে ওর স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। আমি পারব না।

মা একটু ভাবে। তারপর বলে—ঠিক আছে। ভাগ্যকেই মানতে হবে। মুশকিল এই যে আমি একজন নারী। দুশ্চিন্তা ছাড়া আমার কিছুই করার নেই। খিজিরকে আমি ভাবী সুলতান বলে কোনওদিন ভাবতে পারিনি। কোথায় যেন বাধো বাধো ঠেকেছে। কিন্তু এখন তুই ওর বেগম। এখন একটু একটু করে ওর ওপর আমার স্নেহ পড়েছে, ওর সবরকম মঙ্গল আমি মনেপ্রাণে চাই। তবু আমার বরাবরের বিশ্বাস সুলতানের ভার বহন করার মতো শক্ত কাঁধ ওর নয়। বরং দেখিস, ওর একটা ছোট ভাই আছে, বয়সে ওর চেয়ে অনেক ছোট। সে একটা কিছু করে বসবে। সে হাওয়ায় ভাসে না। শক্ত মাটির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। সে খুব চালাকও, আর খুব নিষ্ঠুর বলে মনে হয়। নিষ্ঠুরতা দিল্লির সুলতান হওয়ার আবশ্যিক গুণ। মুবারক তার নাম।

—আমি ওর সুলতান হওয়ার জন্য ব্যস্ত নই মা। সুলতান না হলেও চলবে। ও শুধু বেঁচে থাক, তাতেই হবে।

মা বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে তোর কি মতিচ্ছন্ন হয়েছে?

—একথা বলছ কেন মা?

—খিজির সুলতানের বড় ছেলে। তাকে ভাবী সুলতান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তার সুলতান না হওয়ার একটাই অর্থ, তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আমি মায়ের মুখ চেপে ধরি।

মা বিরক্ত হয়ে আমার হাত সরিয়ে দিয়ে বলে—স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকলে শক্ত পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকা যায় না। আমি আমার দুর্দিনে তোকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনার সংকল্প করেছিলাম বলেই তোকে ফিরে পেয়েছি। তবে সবার আগে ভাগ্য। খিজিরের বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হল তার সুলতান হওয়া। বিকল্প কোনও পথ নেই। এই পথ খুব বিপদ সংকুল। অনেকে তার আগেই খতম হয়ে যায়।

মায়ের এইসব কথায় অতিষ্ঠ হয়ে আমি বলি—তুমি এমন অশুভ কথা শোনাচ্ছ কেন? তুমি আমার গর্ভধারিণী বলে সব যেন জেনেশুনে বসে আছ।

—না, সব জানি না। তবে অনেক কিছু জেনেছি তো বটেই। সুলতানের মসনদের দিকে লোলুপ দৃষ্টি অনেকের থাকে। আলাউদ্দিনেরও যেমন ছিল। তাঁর আগের সুলতান ছিল জালালউদ্দিন খিলজী। খিলজী বংশের পত্তন তাঁর হাতে। তাঁর বড় ছেলে ছিল ইখতিয়ারউদ্দিন। সে-ই ছিল খান-ই-খানান বা হবু সুলতান। কোথায় গেল সে? কোথায় গেল জালালউদ্দিনের অন্যান্য ছেলেরা? সুলতান আলাউদ্দিন তো তাঁর ভাই-এর ছেলে। জালালউদ্দিন সুলতান হয়েও শেষ বয়সে ভ্রাতুষ্পুত্রের হাতে নিহত হলেন। কেন? কারণ হল আকাশ-ছোঁয়া উচ্চাশা। তুই কৃষক পরিবারের বধূ নোস্। বৈচিত্র্যহীন ছোট সুখ আর দুঃখ নিয়ে দারিদ্র্যের মধ্যে শুধু বেঁচে থাকা—হ্যাঁ, তাতে হঠাৎ নিহত হতে হয় না বটে। বেছে নে দুটোর একটা। তবে কৃষক হলে দুদিনও বাঁচবি না। তোদের ধাতে নেই।

—বুঝেছি।

—পারলে খিজিরকেও বুঝিয়ে দিস।

—এই কথা বললে তার স্বপ্নভঙ্গ হবে।

—এমন স্বপ্ন ভেঙে যাওয়াই ভাল। তাহলে বুঝতে হবে সে তোকে ভালবাসে না। তোর রূপে মোহাবিষ্ট হয়ে রয়েছে শুধু। আমি আজ উঠি।

মা এইভাবে হঠাৎ বিদায় নেওয়ায় বুঝলাম আমার ওপর অতিমাত্রায় বিরক্ত হয়েছে। আমিও পরে ভেবে দেখলাম মায়ের উদ্বেগ একেবারে অলীক নয়।

খিজির খাঁ আমার ঘরে আসার আগেই তার পদশব্দ শোনা যায়। ও যতক্ষণ অনুপস্থিত থাকে আমি তার কথা ভাবলেও উৎসাহে কিছুটা ভাটা পড়ে। প্রতিদিন পরিচিত পদশব্দ শুনলে উদ্দীপনায় হৃদপিণ্ডের গতি বেড়ে যায়। আমার কক্ষ ছাড়িয়ে একেবারে দক্ষিণের ঘরে থাকে খিজিরের বড় বেগম। ওর পদশব্দ আমার কক্ষ ডিঙিয়ে কখনও দক্ষিণের দিকে যায় না। একদিন অপরাহ্নে তার দ্রুত পদশব্দ পেলাম। নিশ্চয় কোনও উৎসাহের খবর রয়েছে। কিন্তু পদধ্বনি আমার ঘরের সামনে প্রতিদিনের মতো থেমে গেল না। আরও এগিয়ে একেবারে দক্ষিণের শেষ প্রান্তে গিয়ে মিলিয়ে গেল অর্থাৎ বড় বেগমের ঘরে। কেন? হঠাৎ কি অনুতাপ হচ্ছে প্রথম বেগমকে এতদিন অবহেলা করেছে বলে? হতেই পারে। বিবেক সবারই থাকে। আমি তো তাকে প্রকারান্তরে বলে দিয়েছি প্রথম বেগমের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে। তাহলে এখন কেন আমি এত দমে গেলাম?

আনোয়ারাকে ডাকি।

সে এসে দাঁড়ায়।

—খিজির এল না?

— হ্যাঁ।

—কোথায় গেল?

—বড় বেগমের ঘরে।

—আমার ঘরে না এসে—

আনোয়ারা নিরুত্তর। এখানে উত্তর দেওয়া ধৃষ্টতা। একটু পরে বলল—সুলতানজাদাকে খুব ব্যস্ত আর গম্ভীর বলে মনে হল। কোনও ভাল খবর বলে তো মনে হয় না।

—কী এমন খারাপ খবর হতে পারে? বেগমের মা বোন কি অসুস্থ?

—আমি বলতে পারছি না। ওঁর বাঁদীও সুলতানজাদার সঙ্গে ভেতরে ঢুকেছে।

—বাঁদী ঢুকেছে? সে কী কথা?

সেই সময় একটা চাপা ক্রন্দনধ্বনি ভেসে আসে বড় বেগমের ঘর থেকে। সেই কান্না আরও বেড়ে যায়। আনোয়ারা আমার অনুমতি ছাড়াই ছুটে বাইরে চলে যায়। ভালই করেছে। একটা কোনও খবর ঠিকই আনবে।

একটু পরেই আনোয়ারা এল হাঁপাতে হাঁপাতে। খুব উত্তেজিত। তার মতো সংযত মেয়ের এই অবস্থা দেখে আমি বুঝলাম সাংঘাতিক কিছু ঘটে গিয়েছে। আমার মনের মধ্যে তখন হাজার প্রশ্ন। কিন্তু কিছুই না বলে চুপ করে রইলাম। জানি, আনোয়ারা একটু সামলে নিয়ে নিজেই বলবে।

—আল্প্ খাঁ খুন হয়েছেন, বেগম সাহেবা।

কথাটা তড়িতের মতো আমার সর্বাঙ্গ অবশ করে দেয়। আমার বাক্‌রুদ্ধ হয়ে যায়। মনে হয় দম আটকে আসছে। শুধু ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম আরও কিছু শোনার জন্য। কিন্তু ও আর কিছু বলল না।

খানিক পরে ধাতস্থ হয়ে জিজ্ঞাসা করি—কে? কে করল?

—আর কিছু জানি না। ও আর কিছু বলতে পারল না।

—আর একবার যাও।

—সুলতানজাদা এখনও ওই ঘরে আছেন। আমাকে দেখলে অসন্তুষ্ট হতে পারেন।

—এখনও আছে?

—হ্যাঁ, সান্ত্বনা দিচ্ছেন। বাঁদী বলল, চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছেন। কোলে তুলে নিয়েছেন। বাঁদীকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। এটা ভ্রূক্ষেপ করার সময় নয় বেগমসাহেবা।

—ঠিক বলেছ। এখন কি ওসব দেখলে চলে? আমি একবার যাব আনোয়ারা?

—আপনি!

—হ্যাঁ, এই দুঃসময়ে তো সবাই যেতে পারে।

—আমার কোনও দোষ হবে না তো?

—তোমার দোষ হবে কেন? আমি কি বন্দিনী? তুমি কি আমাকে পাহারা দিচ্ছ?

—না তবে সুলতানজাদা আছেন—

—থাকুক। আমি চললাম।

আমাকে দেখে খিজির বিস্মিত হল। সে বলল—এসো দেবল। এমন হবে, আমি কল্পনাও করিনি। কাফুর শেষে এই কাজ করল? সুলতানের এত বিশ্বাসের এই প্রতিদান? তিনি আজ অক্ষম বলে এই স্পর্ধা। তুমি এসে ভালই করেছ। আমি এবারে যাই, একটা কিছু করতে হবে।

—সাবধান সুলতানজাদা। অন্য আমীরদের ডেকে পাঠান।

—ঠিক বলেছ। আমি চলি।

খিজির দ্রুত চলে গেল। বেগম আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। আমি তার গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে থাকি। এক সময় ও কান্না একটু সামলে নিয়ে নম্র কণ্ঠে বলে—আমি আর মাল্‌কা-ই-জাহান হতে পারব না।

—কেন পারবে না? সুলতান জীবিত। তবে খিজিরকে খুব সাবধানে থাকতে হবে।

—সেকথা নয়। বাবা নেই, মাহরুবেগমের কি আমার কথা মনে থাকবে? বাবার কত প্রতিপত্তি ছিল। এখন আমি সাধারণ হয়ে গেলাম।

আমি ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার কথা একেবারে ভুলে যাই। এসব কী বলছে আল্‌প্ খাঁয়ের কন্যা? এ যে অবিশ্বাস্য। খিজির একে ঠিক চিনেছিল। উদ্ধত নয়, কড়া কথা বলে না, অথচ নিজের স্বার্থটুকু ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। নিজের জন্মদাতার ওপরও বিন্দুমাত্র টান নেই।

ওর নীচ মনের পরিচয় পেয়ে আমার ঘৃণা হয়। ওকে বলি—সেজন্য তোমার কোনও চিন্তা নেই। ওসব মিথ্যে কল্পনা করে মন খারাপ করো না। খিজির যদি সুলতান হয়, তুমিই হবে মাল্‌কা-ই-জাহান।

ওর মুখে কেমন একটা হাসি ফুটে ওঠে। বলে—আর তুমি?

—আমি সাধারণ বেগম হয়ে থাকব।

—তুমি বললেই আমি বিশ্বাস করব? তাই কখনও হয়? তুমি তো খিজিরের সেই অতি-ভক্তির নিজামউদ্দিন আউলিয়া নও। অবিশ্যি অনেকেরই ওঁর সম্বন্ধে একই রকমের ধারণা।

—ওঁর সঙ্গে আমার তুলনা? উনি একজন অতি উচ্চস্তরের ফকির। আমি তো সাধারণ একজন নারী। তবে তুমি বিশ্বাস করো আমার এসবে কোনও লোভ নেই। তুমি বললে আমি লিখে দিতে পারি। আমার লেখাই প্রমাণ হয়ে থাকবে। খিজির যদি সুলতান হয়, তুমি তাকে দেখাবে।

—ও মানবে না।

—মানবে। কিন্তু এখন কি এইসব আলোচনার সময়?

—না, তা নয়। আমি তোমাকে কাগজকলম দিচ্ছি, তুমি লিখে দিয়ে যাও।

আমার সর্বাঙ্গ রিরি করে ওঠে। ওর সুদৃশ্য কলমটা হাতে নিয়ে আমি স্পষ্ট অক্ষরে মুচলেকা লিখে দিই যে আমি মাল্‌কা-ই-জাহান কখনও হব না। সুলতান খিজির খাঁ

হুকুম দিলেও সেই হুকুম আমি মানব না। এর জন্য যদি কোন শাস্তি পেতে হয় আমি মাথা পেতে নেব।

বড় বেগমের সারা মুখ হাসিতে ভরে ওঠে। সে সযত্নে কাগজটি ভাঁজ করে এমনভাবে মাথা হেলায় যে মনে হল আমাকে চলে যেতে বলছে। বাইরে এসে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি।

আনোয়ারা আমাকে বড় বেগমের ঘব থেকে বাইরে আসতে দেখে আমার পেছনে পেছনে ঘরে এসে ঢোকে। আমি বুঝতে পারি, ওর মনে হাজার কৌতূহল। তবু কিছু প্রশ্ন করতে সাহস পাচ্ছে না।

—কিছু জানতে চাও আনোয়ারা?

—উনি কি একটু শান্ত হয়েছেন? এমন আঘাত যেন শত্রুও না পায়। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

আমি উত্তেজিত স্বরে বলি—তোমার কষ্ট হয়ে লাভ কী? ওর মুখে তো হাসি ফুটিযে দিয়ে এলাম। বাবার মৃত্যুর কথা এতক্ষণে ভুলে গিয়েছে।

আনোয়ারা চুপ করে থাকে। বুঝতে পারে কোনও কারণে আমার মেজাজ ঠিক নেই। তাই আমার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

–দাঁড়িয়ে রইলে কেন? রাজধানীর অন্যত্র যা-ই ঘটুক না কেন, এই মহলে সব স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। শুনেছি গুজরাটবাসীরা ওঁকে খুব পছন্দ করে। ওখানে এই মর্মান্তিক খবর পৌঁছোলে আগুন জ্বলতে পারে। তবু এই মহল শান্তই থাকবে। কারণ আমি মুচলেকা লিখে দিয়ে এলাম।

—কিসের মুচলেকা বেগম সাহেবা?

—খিজির খাঁ সুলতান হলে আমি প্রধানবেগম হওয়ার দাবি করব না। আল্‌প্‌ খাঁ খুন হওয়ায় এটাই ওর সবচেয়ে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল। আল্‌প্‌ খাঁ তাঁর প্রভাব আর খাটাতে পারবেন না বলে ওর কান্না পেয়েছিল।

—এ কি সত্যি!

—হ্যাঁ, এবারে একটু একা থাকতে দাও। আমার মাথার মধ্যে কেমন করছে। রাতে আমার খেতে ইচ্ছে না হলে সাধাসধি করো না।

আনোয়ারা আস্তে আস্তে ঘর থেকে বাইরে চলে যায়।

—দেবল।

আমি চমকে উঠি। মা এসে ঢুকছে।

—এ কী! তুমি চলে এলে? রাস্তাঘাট স্বাভাবিক?

—অস্বাভাবিক কিছু দেখলাম না। তাছাড়া আল্‌প্‌ খাঁ খুন হোক আর যা-ই হোক রাজধানীর মানুষের ওপর তার প্রভাব পড়বে না। গুজরাটে একটা কিছু হতে পারে।

শুনেছি সেখানে সে খুব জনপ্রিয় ছিল। গুজরাটের জন্য এখনও আমার মন কাঁদে দেবল। যাহোক যেকথা বলতে এলাম। বলেই চলে যাব। উচ্চাশার প্রথম খুন হল আজ। এই সবে শুরু। মনে হচ্ছে এরপর সুলতানের মৃত্যু যেভাবেই হোক হবে। তারপরেই কিন্তু খিজিরের পালা।

—কী হবে মা।

—আমি শুধু ভাবছি খিজির কাফুরকে সরিয়ে দিচ্ছে না কেন? সুলতান এখন সক্ষম নন। তিনি এখন কাফুরের ক্রীড়নক। খিজির আমীরদের সঙ্গে কথা বলুক। তারপর কাফুরকে সরিয়ে দিক।

—কীভাবে?

—যেভাবেই হোক। আল্‌প্ খাঁ যেভাবে সরল, সেভাবেও হতে পারে।

—খিজির খুন করবে?

—করবে না করাবে। ওর একটা অসুবিধা রয়েছে কাফুর সব সময় সুলতানের আশেপাশে থাকে। কিন্তু ভাবী সুলতান হিসাবে ওর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। শুধু জানে না কীভাবে সেই প্রভাব প্রয়োগ করতে হয়। দেরি হয়ে যাচ্ছে। ওকে বলিস। আমি আজ চলি।

—আর একটু বসো মা।

—এখন পারব না। সুলতানের কিছু হতে পারে। হারেমে থাকাই ভাল। মাহরুবেগম খুব কাঁদছে। কষ্ট হয়। তার যতই প্রভাব থাক যতই হম্বিতম্বি করুক বুদ্ধিমতী বলে কোনওদিন মনে হয়নি। ওর উচিত সুলতানকে তাঁর ওখান থেকে এনে হারেমে কোথাও রাখা।

—তাহলে ওঁর সঙ্গে সবাই দেখা করবে কী করে?

—সেটাই হল অসুবিধা। হারেমে বসে তো দেশ শাসন করা যায় না। এক হতে পারে, উনি সাময়িকভাবে খিজিরকে দায়িত্ব দিতে পারেন। কিন্তু কাফুর তা হতে দেবে না। আর সুলতান তাকে ছাড়া কারো কথায় কান দেয় না। দেখা যাক আল্‌প্ খাঁয়ের মৃত্যুতে তাঁর চোখ খোলে কি না।

মা চলে যায়।

কদিন পরে সুলতান হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। খিজিরের মুখ দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে যায়। সে বলল—আমি ফকির নিজামউদ্দিন আউলিয়ার কাছে লোক পাঠিয়েছি। উনি সুলতানকে আর আমাকে খুব পছন্দ করেন। ওঁর দৌলতে সুলতানের উন্নতি।

—ভালই করেছ।

—আমিও যাব অন্য এক ফকিরের কাছে।

—কোথায়?

—হস্তিনাপুরে। হাকিমরা কিছুই করতে পারছে না। তার ওপর কাফুর হাকিমকেও সব সময় ঢুকতে দিচ্ছে না।

আমি অধৈর্য হয়ে বলি—তুমি না তাঁর বড় ছেলে? তুমি না ভাবী সুলতান? তুমি কী করছ? কাফুরকে সরিয়ে দাও ওখান থেকে। তুমি একবার মাথা তুলে দাঁড়াও। কাফুরের ক্ষমতা মুহূর্তে উধাও হয়ে যাবে।

—তুমি জান না দেবলরানী, বাবা ওর কতখানি বশীভূত। তেমন কিছু করতে গেলে হয়ত আমাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেবেন।

—তাই কখনও হয়?

—হাঁ, হয়। কয়েকজন আমীব কী বলে জানো? তারা বলে, ওকে শেষ করে দিতে। বলে, এতে সবার সম্মতি রয়েছে।

—তাদের কথা অনুযায়ী চল।

—তুমি শেষে খুন করতে বললে?

— শোনো সুলতানজাদা আমার দেহে রাজপুত শোণিত বইছে। রাজপুতরা যুদ্ধে শত্রুকে নিধন করে কিংবা নিজে মরে। এটা এক ধরনেব যুদ্ধ। বলতে পারো প্রচ্ছন্ন যুদ্ধ। এতে হত্যা অপরাধ নয়। ওকে সরিয়ে দেওয়ার কথা আমার মাথায় প্রথম আসেনি। আর একজন বলেছিল। আমিও প্রথমে চমকে উঠেছিলাম। ভেবেছিলাম তুমি কখনওই খুনী হতে পারো না। কিন্তু এটা তো খুন নয়, এটা রাজ্য রক্ষা।

—আগে ঘুরে আসি তারপরে দেখা যাবে।

—কোথায় যাবে?

—বাবার সামনে দাঁড়িয়ে শপথ নিয়েছি হেঁটে হস্তিনাপুরে যাব সেই ফকিরের কাছে। গিয়ে বাবার নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা জানাব।

—এই সময় রাজধানী ছাড়বে?

—বললাম যে, শপথ নিয়েছি।

—কখন যাবে?

—একটু পরেই।

—একা যেও না কখনও।

—না।

খিজির চলে যাওয়ার সাতদিন পরে আনোয়ারা একদিন এসে বলে—বেগম সাহেবা একটা খুব দুঃসংবাদ শুনলাম।

আমার বুক কাঁপে। সুলতানের মৃত্যু হলেই খিজিরের পালা। বলে উঠি—সুলতান ভাল আছেন তো?

—হ্যাঁ, আগের চেয়ে অনেক ভাল। তিনি নিজে বলেছেন, ফকিরের কাছে সুলতানজাদার প্রার্থনায় তাঁর উন্নতি হয়েছে।

—এ তো সুখবর।

—কিন্তু একথা তো আমি বলিনি। আমি সুলতানজাদার সম্বন্ধে যা রটনা করা হয়েছে, সেই খবর বলতে চাইছি।

—কী?

—কাফুরের লোকজন রটিয়ে বেড়াচ্ছে সুলতানজাদা হস্তিনাপুরের ফকিরের কাছে না গিয়ে নাচনেওয়ালী আর গাইয়েদের নিয়ে ফুর্তি করছেন। লোকে বিশ্বাসও করতে শুরু করেছে। এইসব শুনে সুলতান চটে গিয়ে তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি শাস্তি দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন।

পরদিনই সম্পূর্ণ বিপরীত খবর। আনোয়ারা আজকাল রোজই বাইরে যায় খবর সংগ্রহের জন্য। সংগ্রহের ক্ষমতাও রয়েছে, সূত্রও রয়েছে। ও যদি বেগম হত, তাহলে চিমনা বেগমের সমপর্যায়ের না হলেও, সুলতানকে সৎপরামর্শ দিতে পারত। কিন্তু চিমনা বেগম হলেই সার্থক হওয়া যায় না। চিমনা বেগম নিজেই তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। যদিও সুলতানের চেয়ে বড় শত্রু তার কেউ নেই তবু তার প্রতি সুলতানের পরবর্তী ব্যবহারে সে তাঁর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী হয়ে উঠেছে। কিন্তু পৃথিবীতে বহু মানুষ রয়েছে যারা শুভাকাঙ্ক্ষা গ্রহণ করতেও অপারগ।

আনোয়ারা এসে বলে—আগের দিনের খবর ঠিক নয়।

আমি একটু স্বস্তি পাই। বলি—তা হলে সুলতান রেগে যাননি?

—ঠিক বলতে পারছি না। মনে হয় এর মধ্যে কোনও কৌশল রয়েছে।

—কী কৌশল?

—কামালউদ্দিন একটা খবর জানিয়েছে। কামালউদ্দিনকে চেনেন তো?

—না।

—সে কি! সুলতানজাদা আপনাকে বলেননি?

—তুমি কথার মালা গেঁথে দেরি না করে আমাকে সোজাসুজি বলো। আমি আর সইতে পারছি না।

—কামালউদ্দিনই ছিল আল্প্ খাঁয়ের হত্যাকারী। তার তরবারির আঘাতে আল্প্ খাঁয়ের মাথা ছিট্‌কে পড়েছিল। পেছনে দাঁড়িয়েছিল কাফুর। সে তখন দাঁত বের করে হাসছিল। এই দৃশ্য দুজন মানুষ স্বচক্ষে দেখেছে। তাছাড়া শুনি কামালউদ্দিন এই নিয়ে গর্ব করে বেড়ায়।

—আশ্চর্য! এত ওমরাহ রয়েছে, তবু সে নিজের মুখে সব বলে বেড়াচ্ছে? কেউ কিছু বলছে না? খিজির থাকলে এমন হতে পারত না।

—কে যে নিজের কোন্ স্বার্থসিদ্ধির স্বপ্ন দেখছে কে বলতে পারে? কাউকে বিশ্বাস করার উপায় আছে?

—যাক্‌গে ওসব কথা। কামালউদ্দিন কী বলেছে?

—সুলতানের নাকি হুঁশ হয়েছে তাঁর ছেলে আল্প্ খাঁয়ের মৃত্যুতে খুবই শোকাচ্ছন্ন। তাঁকে তিনি রাজধানীতে ফিরে না এসে আমরোহতে গিয়ে কিছুদিন গানবাজনা আর

আনন্দ করে কাটিয়ে আসতে বলেছেন।

—ও ফিরে আসাই ভাল। আমি ওকে না দেখে থাকতে পারছি না।

আনোয়ারা এবারে গম্ভীর হয়ে বলে—আমি হারেমে গিয়েছিলাম। আপনার মায়ের সঙ্গে দেখা করিনি। তবে চিমনা বেগমের সঙ্গে দেখা করেছি।

আমার তীব্র কৌতূহল হয়। ভাবি আনোয়ারার তুলনা হয় না। প্রশ্ন করি—তিনি কী বললেন?

—উনি বললেন, কাফুর কৌশলে সুলতানজাদাকে দূরে সরিয়ে রাখছে। ইতিমধ্যে সে একটা কিছু করার ফন্দি আঁটছে। চিমনা বেগম রীতিমতো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তিনি একটা সর্বনাশের ছায়া দেখতে পাচ্ছেন। উনি বলছেন, সুলতানজাদার এখনই ফিরে আসার খুবই প্রয়োজন।

কথাটা শুনে আমার কান্না পেল। আনোয়ারার সামনে কাঁদতে পারলাম না। মাকে কাছে পাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হল। কিন্তু কিছু করার নেই। আমি এত অস্বস্তি অনুভব করি যে ছুটে বাইরের দিকে যাই। আনোয়ারা আমার পেছনে পেছনে এসে বলে—একী করছেন বেগমসাহেবা?

—আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে আনোয়ারা। আর পারছি না। আমি চিমনা বেগমের সঙ্গে দেখা করব। আমি মায়ের কাছে যেতে চাই না।

সেই সময় দেখতে পাওয়া যায় নিষ্ঠুর মুখের প্রহরী ধীরে ধীরে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

আনোয়ারা বলে ওঠে—মুনির আসছে।

—মুনির!

—ওর নাম তো মুনির।

মুনির আমার সামনে এসে কুর্নিশ করে। অত্যন্ত বিনীতভাবে বলে—আমার বে-আদপি মাফ করবেন বেগম সাহেবা। খুনী কামালউদ্দিন একজনকে খুন করেছে, এবারে আর একজনকে করার মতলব করছে।

আনোয়ারা সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে—তুমি কি কাফুরের বিপক্ষে?

—বরাবর। শুধু অবস্থার গতিকে এই কাজ করতে বাধ্য হচ্ছি। আমি অনেক খুন করেছি। কিন্তু সেই সব খুন এমন গোপনে নয়। রাস্তায় দাঁড়িয়ে লড়ে লোকের বুকে ছুরি বসাতে পারি, গলার নলি কাটতে পারি।

আমি ইঙ্গিতে আনোয়ারাকে বললাম, কেন সে এসেছে জিজ্ঞাসা করতে।

আনোয়ারার কথা শুনে সে বলে—সুলতানজাদার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। আমি এখন সামান্য মানুষ হলেও কামালউদ্দিন আমার কাছ থেকে ছুরি চালানো আর গলা কাটার কায়দা শিখেছিল। আমি তার ওস্তাদ। তাই এখনও রাতে আমার কাছে আসে। সে জানে আমি খেপে গেলে কিছু একটা করে দিতে পারি। ও আমাকে বলেছিল, সুযোগমতো

সুলতানজাদাকে শেষ করে দিতে। অনেক ইনাম পাব। আমি অস্বীকার করেছি। বলেছি, আমি সুলতান আলাউদ্দিনের অধীনে কাজ করি। বেইমানি করতে পারব না। সে আরও কিছু বলত, কিন্তু আমি একথা বলে ফেলায়, সে থেমে গেল। আর কিছু ভাঙল না।

মুনিরের কথা শুনে আমি আতঙ্কিত হই। সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে ওঠে। আমি নিজেই এবারে বলি—তোমাকে আমি সম্পূর্ণ অন্যরকম ভাবতাম।

—জানি। বেগমসাহেবা, আমার মনে হয় আমাকে হয়ত আর এখানে রাখা হবে না। তাই যদি হয়, তাহলে আমি একদিন এসে তাকে খতম করে দিয়ে যাব।

—তাতে লাভ?

—না, তাতে কোন লাভ নেই। আমি কামালউদ্দিনকে খুন করব। কাফুরকেও করব।

—তোমার বিপদ হবে না?

—হবে। কিন্তু আমি তোয়াক্কা করি না। ওরা জানে, আমি মরলেও দুটোকে নিয়ে মরব।

মুনির আবার সসম্ভ্রমে সেলাম জানিয়ে প্রধান ফটকের দিকে চলে যায়।

আমার বুকের ভেতরে তোলপাড় করে। খিজিরকে শেষ করতে ইতিমধ্যেই গুপ্তঘাতক নিয়োগের চেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছে। একমাত্র মুনিরই ওকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পেতে পারত। তাই তাকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার অর্থই হচ্ছে একজন ঘাতককে তার জায়গায় আনা।

আনোয়ারকে এতদিনে রীতিমতো বিচলিত বলে মনে হল। সে বলে—আমি আবার হারেমে যাব।

—এই রাতে?

— ওরা হস্তিনাপুরে সম্ভবত ঘাতক পাঠাবে না। আমরোহতেও বোধহয় কেউ যাবে না। রাজধানীই সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা। তবে কোনও জায়গাই এখন নিরাপদ নয়। আল্‌প্‌ খাঁ খুন হলেন সুলতানের চেয়ে পঞ্চাশ হাত দূরত্বের মধ্যে।

—তুমি বরং কাল খুব ভোরবেলায় যেও।

কিন্তু প্রত্যুষের অনেক আগেই খিজির এসে হাজির। আমি ওর চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। তবু ওকে জীবিত দেখে আশ্বস্ত হলাম।

—কী হয়েছে খিজির? তোমার এখন রাজধানীতে থাকা খুব প্রয়োজন। তোমাকে শেষ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে।

খিজির বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে—আমি বোধহয় সুলতান হতে পারব না। সুলতান আমার ওপর প্রচণ্ড রেগে গিয়েছেন। ওই খোজা কাফুর বাবাকে একেবারে বশ করে নিয়েছে। সুলতানের যে সব চিহ্ন আমার কাছে ছিল, যার ফলে আমি অনেক ক্ষমতার অধিকারী ছিলাম, সব ফেরত দিতে বলেছেন সুলতান। আমি পাঠিয়ে দিয়েছি।

—কেন দিলে?

—দেব না? বাবার দস্তখত করা চিঠি পাঠানো হয়েছিল। আমাকে আমরোহতে যেতে বলা হয়েছিল। এসব দেখে আমার মনে হল একটা চক্রান্ত চলছে। তাই আমি সব ফেলে রেখে একা অন্ধকারে একটা ঘোড়ায় চেপে ছুটে এসেছি। প্রথমে মায়েব কাছে গেলাম। কোনও বুদ্ধি বাতলাতে না পেরে সে শুধু কাঁদতে থাকে। তখন গেলাম চিমনা বেগমের কাছে। তিনি বললেন, সোজা সুলতানের কাছে গিয়ে তাঁর পায়ের কাছে বসে হাঁটু চেপে ধরে বলো যে তুমি কোনও অন্যায় করোনি। তবু না জেনে কিছু করে ফেললেও তিনি যেন মাফ করে দেন। চিমনা বেগম সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে যেতে বললেন। গুপ্ত অস্ত্রও রাখতে বললেন। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন—সুলতানের সামনে কাফুরকে খতম করে দিতে পারো? তাহলে সব বিপদ কেটে যাবে। তুমিই বল দেবল, তাই কি সম্ভব? আমি সকাল হলেই সুলতানের কাছে যাব।

বাকি রাতটুকু আমার দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে শুধু চোখের জল ফেললাম। বারবার ভাবলাম এই রাত যেন শেষ রাত না হয়। আবার ভাবছিলাম, এই রাতই যেন আমাদের দুজনারই শেষ রাত হয়।

কিন্তু রাত শেষ হয়। খিজির তার নতুন বেশে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে একসময় সামনে এসে আমাকে বলে—তাহলে আসি দেবলরানী।

আমি কান্না সামলে নিয়ে বলি—প্রহরীর সঙ্গে দুটো কথা বলে যেও। ওরা তোমাকে খুন করার জন্য ওকে এখানে রেখেছিল। কিন্তু ও তোমার পক্ষে। আমাকে সব বলেছে।

—যদি বেঁচে থাকি, তাহলে ওর পদোন্নতি হবে।

আমি আর আনোয়ারা জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলাম। খিজির ফটকের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই মুনির তাকে যথাযোগ্য সম্মান দেখায়। খিজির তাকে কী যেন বলল। সঙ্গে সঙ্গে সে খিজিরকে কিছু বলে। খিজির আবার ভেতরের দিকে এসে দাঁড়াল। একটু পরে মুনির একটি ঘোড়া প্রস্তুত করে এনে দাঁড় করাতে খিজির এগিয়ে গিয়ে সেটিতে চাপতে যাওয়ার আগে মুনির আবার কী যেন বলল। তারপর সে খিজিরকে বারে বারে কুর্নিশ করতে থাকে। খিজির ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়।

একটু পরে মুনির এসে আনোয়ারাকে বলে যে সুলতানজাদা তার ওপর বেগমসাহেবার দেখাশোনার ভার দিয়ে গেলেন। উনি হয়ত ভাবছেন উনি আর ফিরবেন না। আমিও কাফুরকে খুন করব। সে নিস্তার পাবে না।

কিন্তু মুনিরের মুখে খিজিরের এই আশঙ্কার কথা শুনে আমি মেঝেতে কান্নায় লুটিয়ে পড়ি। এতদিন পরে আবার আমার জন্মদাতার কথা হঠাৎ মনে পড়ে যায়। ওঁর কথা চিন্তা করে কোনওরকম সান্ত্বনা পাব বলে নয়, আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন বলে আজ আমার এই দুর্দশা। আমার অগ্রজা ভাগ্যবতী। এই ক্লেদাক্ত পৃথিবীর জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়নি তাকে। আমারও যদি অমন হত, বত ভাল হত।

আনোয়ারা একসময় এসে আমাকে বলে, সুলতানজাদা চলে যাবার পর থেকে মুনির

খুব ছট্‌ফট্‌ করছে। একবার এদিক, আর একবার ওদিক করছে। মাঝে মাঝে রাস্তার কাউকে ডেকে এটা-ওটা জিজ্ঞাসা করছে। কয়েকজন এসে ওকে কিছু বলেও যায়।

এতে আমার উদ্বেগ আরও বেড়ে গেল। আনোয়ারা এই প্রথম নীচে বসে আমার গায়ে হাত দিয়ে বলে—এখন তো ভেঙে পড়লে চলবে না বেগমসাহেবা। এখন ধৈর্য ধরার সময়। এভাবে চললে আপনারই শরীর ভেঙে পড়বে।

—কী হবে এই দেহ রেখে বলতে পারো আনোয়ারা? কী লাভ?

—তবু মনকে স্থির রাখার চেষ্টা করুন। জানি শান্ত থাকা সম্ভব নয়। তবু যতটা সম্ভব। জীবনে দুর্যোগ যেমন আসে, তেমনি চলেও যায়।

অপরাহ্ণে আনোয়ারা এসে আমাকে বলে, খোজা মুনির ফটকের সামনে ক্ষিপ্তের মতো ব্যবহার করছে। অথচ ওর আশেপাশে কেউ নেই। দূর থেকে কিছু নগরবাসী জড়ো হয়ে ওর দিকে চেয়ে কী যেন বলাবলি করছে। ও নিশ্চয় কোনও খবর পেয়েছে বেগমসাহেবা। ওকে ডাকব?

—ডাকো। এখনি ডাকো।

আনোয়ারা চলে যায়। আমি উঠে ঘর থেকে বাইরে এসে অনেকটা এগিয়ে যাই। তখন দেখি আনোয়ারা পৌঁছনোর আগেই একজনকে সঙ্গে নিয়ে মুনির আসছে। আমি পর্দার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াই।

মুনির লোকটাকে আমার পর্দার সামনে এনে আমাকে উদ্দেশ করে বলে—বেগমসাহেবা, ইনি এসেছেন সুলতানজাদার খবর দিতে।

লোকটা বলে—বেগমসাহেবা কোথায়? কাকে বলব?

—আপনি বলুন উনি শুনতে পাবেন।

লোকটা বলে- সুলতান আলাউদ্দিনের হুকুম মোতাবেক সুলতানজাদাকে গোয়ালিয়র কেল্লায় নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়েছে।

কথাটা শোনামাত্র আমি অচেতন হয়ে পড়েছিলাম। যখন জ্ঞান ফিরল, তখন দেখি আমি নিজেরই কক্ষে, নিজের পালঙ্কে শুয়ে রয়েছি। চারকোণে চারটি বাতি জ্বলছে। আস্তে আস্তে হাত দিয়ে দেখি মাথার পেছনের দিকে একটা জায়গায় উঁচু হয়ে রয়েছে। আনোয়ারা আমার শিয়রে বসে রয়েছে।

—কী হয়েছে আনোয়ারা?

—আপনি পড়ে গিয়েছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সব কথা আমার মনে পড়ে যায়। কেঁদে উঠে বলি—কী হল আনোয়ারা? তারপর কী হল? তার সঙ্গে দেখা হবে না?

—লোকটা সেই কথাই বলে গেল। কিন্তু আসল কথা বলল মুনির।

— সে কী করে জানল?

আনোয়ারা বলে - মুনির তো সেই চেষ্টাই করছিল সুলতানজাদা বিদায় নেবার পর থেকে। মতলব সামনে রাস্তায় দুজন অতি বিশ্বস্ত মানুষের দেখা পেল। খোঁজ নিতে বলল।

লোকটা এসে আপনাকে যে সংবাদ দিয়ে গেল সেই সংবাদ মুনির অনেক আগেই পেয়ে গিয়েছিল। তাই অমন ক্ষিপ্তের মতো আচরণ করছিল। সে আরও অনেক বেশি জেনেছিল। সে বলেছিল সুলতানজাদা সুলতানের সামনে গিয়ে বাবার জানু জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন— আপনি এত ভালবাসেন আমাকে, শেষে আমাকে অবিশ্বাস করলেন? আপনার মঙ্গল কামনায় খাজা নিজামুদ্দিনের কাছে লোক পাঠালাম। নিজে পায়ে হেঁটে হস্তিনাপুরে গিয়ে ফকিরদের দরজায় ঘুরলাম। তাঁরা আমার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হলেন। তাঁরা বললেন, আপনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠবেন, যদি কেউ আপনার ক্ষতি না করে। শুনেছিলাম, আপনি একটু সুস্থও হয়েছেন। শেষে আপনিও—

—তারপর আনোয়ারা? তারপর?

সুলতান নাকি পুত্রকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো কেঁদে উঠলেন। বললেন—না না, খিজির, আমি অত নিষ্ঠুর নই। তোমাকে আমি আগের মতোই ভালবাসি।

—আপনি তাহলে আমাকে মাফ করলেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়।

সেই সময় কাফুর তার সামনে একটা গোটানো হুকুমনামা মেলে ধরে। সুলতানের বিবর্ণ মুখ আরও বিবর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি কাঁপা গলায় বলেন—কিন্তু আমি যে এই হুকুমনামায় দস্তখত করে দিয়েছি। তা যে অমান্য করা যাবে না।

—কী এই হুকুমনামা?

—কিছুদিনের জন্য তোমাকে গোয়ালিয়ার কেল্লায় আটক থাকতে হবে। ও কিছু নয়, তাই না কাফুর?

কাফুর দাঁত বের করে বলে—হ্যাঁ মালিক।

—শুনলে তো খিজির, কাফুর বেইমানি করে না।

আনোয়ারাকে মুনির এই কথা বলার সময় অবাক হয়ে বলেছিল—সুলতানজাদা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন কাফুর বেইমানি করেছে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন গোয়ালিয়রে একবার গেলে কেউ কদাচিৎ আবার ফিরে আসে। তবু তিনি সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে গেলেও কাফুরকে শেষ করে দিলেন না কেন? তাকে হত্যা করলে দিল্লির মসনদ নিরাপদ হয়ে যেত। আমার আফশোস হচ্ছে। তিনি ভাবী সুলতানের কর্তব্য পালন করতে ব্যর্থ হলেন। এর জন্য হয়ত তাঁকে সারাজীবন ভুগতে হবে। তবে কাফুরকে আমি বেশিদিন বাঁচতে দেব না। মৃত্যু আমার হয় হোক।

এইসব শুনতে শুনতে আমি বোধহয় আবার মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলাম।

দিন যায়, মাস যায়, আমি একা। মা-ও আমার কাছে আসা বলতে গেলে ছেড়ে দিয়েছে। তার নাকি মস্তিষ্ক-বিকৃতি দেখা দিয়েছে। শেষ যেদিন এসেছিল সেইদিন আমিও তার মধ্যে একটা অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেছিলাম। খিজিরের কথা বলতে বলতে হঠাৎ জোরে হেসে উঠেছিল। বলেছিল—অনু তুই এত কষ্ট পাচ্ছিস। খিজির ফিরে এল বলে।

—সত্যি! সুলতান বলেছেন?

—সুলতান! ও জানবে কী করে? আমি জানি। একটা জাদু আছে। ভাবিস না বুঝলি? ফুর্তি কব। খিজির ফিরে এল বলে।

মা হঠাৎ উঠে চলে যায়। তাব হাসির আওয়াজ শুনতে পাই।

আমার ভাগ্যের জন্য মা কখনও দায়ী নয়। সতীমা বলত, শিশুদের জন্মের পরে বিধাতা স্বয়ং এসে তার কপালে তার ভাগ্য লিখে দিয়ে যান। সেটাই অক্ষয়। সতীমাকে আমি বিশ্বাস করি। সে যে মোমবাতির মতো জ্বলতে জ্বলতে আমাকে আলো দিয়েছে, হৃদয়ে উত্তাপ দিয়েছে। আর নিজে এতদিনে হয়ত পুড়ে শেষ হয়ে গিয়েছে।

আনোয়ারার সঙ্গে আমার বিশেষ কোনও কথা হয় না। ও আমার দিকে তাকায়। আমিও ওর দিকে তাকাই। ও জানে আমি সব সময় ওর কাছ থেকে কোনও আশার বার্তা শুনতে চাইছি। আমি বুঝতে পারি এরজন্য ও সব সময় বড়ই সঙ্কুচিত থাকে।

আমি ওকে ডেকে একদিন বলি—আনোয়ারা তুমি তো কোনও অপরাধ করোনি। আমি জানি সামান্য যে কোনও সংবাদ পেয়ে তুমি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে আমাকে বলবে। প্রথম প্রথম সত্যিই তেমন ভাবতাম। ভাবতাম এই বুঝি তুমি কোনও আনন্দের সংবাদ এনেছ। কিন্তু তা তো সত্য নয়। আমার অভিজ্ঞতা অনেক বেড়ে গিয়েছে আনোয়ারা। আর আমি অবুঝ নই আগের মতো।

আনোয়ারার চোখ বাষ্পাকুল হয়। এই বিষয়ে সে কিছুই বলে না। বরং বলে—-বড় বেগম চলে গেলেন।

—কোথায়?

—গুজরাটে তো কেউ থাকে না এখন। আল্‌প্‌ খাঁয়ের মৃত্যুর পর সেখানে কেউ নেই। তা ছাড়া গুজরাটে এখন ঝামেলা চলছে। ওখানকার অনেক সিপাই বিদ্রোহ করেছে। মনে হয় বড়বেগম ওখানেই তাঁর মায়ের কাছে রয়েছেন। কেউ তো জানতে চায়নি উনি কেন চলে যাচ্ছেন।

—ও। মুনিরকে সরিয়ে দিয়েছে কাফুর।

—না। এখন তো সুলতানজাদা নেই। তাই কসর-ই-লালের কোনও গুরুত্ব নেই বোধ হয়।

আমি এখন কিছুটা নির্বিকার। এখন শুধু ভাবি, আত্মহত্যা করার আগে আর কতদিন অপেক্ষা করব? কখন বুঝব যে খিজিরের ফিরে আসার আর কোনও সম্ভাবনা নেই।

আনোয়ারা বলে—-মুনির তার বাঁ হাতের ওপরের বাঁধন খুলে ফেলেছে।

—কেন, কী হয়েছে?

—ও বাঁ হাতের কবজির ওপরে এক জায়গায় বেঁধে রাখত আপনি লক্ষ্য করেননি।

—হ্যাঁ, রাখত বটে। কখনও কালো পট্টি, কখনও সাদা। তা কী হয়েছে?

—সেটা খুলে ফেলেছে। সেখানে গভীর ক্ষতের পুরনো দাগ। সেই দাগের চারপাশে

সাদা। পুড়ে গেলে যেমন হয়। বিশ্রী দেখতে।

—সেই জন্য বোধ হয় ঢেকে রাখত।

—আমি ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ও বলল, এখন আর ঢেকে রাখার দরকার নেই। এখন সবাই আমাকে চিনলেও কোনও ক্ষতি নেই। আমি জানি আমার কোন্ কাজ বাকি রয়েছে। এই দাগের জন্য আমার অতীতের অনেক কুকীর্তি ধরা পড়ে যেত। মুনিরকে না দেখলেও এই দাগের কথা সবাই জানত। সাবধান হয়ে যেত। আমার সেই অতীত আজ অতীতই। শুধু শেষ কাজটা করার জন্য আমি রয়েছি।

—ও বোধ হয় কাফুরকে মারবে।

—হ্যাঁ, যদি তার আগে ওকে শেষ না করা হয়।

—কী লাভ?

—লাভ আছে বেগমসাহেবা। পুরুষের এই একরোখা প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাব অনেক কাজে লাগে।

ভাবি, ও কি খিজিরকে ইঙ্গিত করে কথাটা বলল? জানি না। জেনেই বা কী হবে? আমাকে যদি গোয়ালিয়ারে খিজিরের কাছে পাঠানো হত, তাহলে অন্তত আত্মহত্যার চিন্তা করতাম না। যেখানে খিজির সেখানেই আমার সুখ। কিন্তু কাফুরের চক্রান্তে আমাকে যেতে দেওয়া হয়নি। সুলতানকে বোঝানো হয়েছে কদিন পরে সুলতানজাদা নিজেই তো ফিরে আসবেন। এর মধ্যে শুধু শুধু আমার এত পথশ্রমের প্রয়োজন কী। মুনির বলেছে, এসব হল কাফুরের ভাঁওতা, খিজির একটু শান্তি পাক তাও সে চায় না।

এর মধ্যে একদিন চিমনা বেগম এসে উপস্থিত হলেন। আগে উনি এলে আমার মধ্যে আনন্দোচ্ছ্বাস দেখা দিত। এবারে কিছুই হল না। শুধু তাঁর সঙ্গে দুটো কথা বলে একটু শান্তি পাব ভেবে ভাল লাগল।

প্রথম কথাই তিনি বললেন—আর একজন তো কসর-ই-লাল ছেড়ে গিয়েছে। তুমি বসে আছ কেন?

—সে তার মায়ের কাছে গিয়েছে। আমি কোথায় যাব?

—হুঁ, তোমার মা তো বদ্ধ পাগল। পাগল না হওয়ার কোনও কারণ নেই। তোমাকে এখানে নিয়ে এসে সে ভুল করেছে, মস্ত ভুল করেছে। নিজের মেয়ের এতবড় সর্বনাশ কেউ করে না।

চিমনা বেগমের কথা মোটেই ভাল লাগে না। বরং মায়ের জন্যে মন অস্থির হয়ে ওঠে। বলি, আমি মাকে দেখতে পারি?

—নিশ্চয় পার। কালই যেও। তবে তোমার মায়ের চিকিৎসার কোনও ত্রুটি নেই। সুলতান নিজে ব্যবস্থা করেছেন।

আমার মুখ ফসকে বের হয়—তাঁর কোনও ক্ষমতা এখনও আছে নাকি?

—তুমি ঠিকই বলেছ। সেই ক্ষমতা নেই। তবে তিনি যদি রুখে দাঁড়ান তাহলে কাফুরও

কিছু বলতে সাহস পায় না। তোমার মায়ের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। তিনি নিজে অশক্ত শরীর নিয়ে তোমার মাকে দেখে গিয়েছেন। বলেছেন, খিজিরকে ফিরিয়ে আনা হবে।

—বলেছেন?

—হ্যাঁ। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে, তিনি একটু সুস্থ বোধ করার কিছুদিন পরই আবার কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েন। কেন এমন হয় বুঝি না। তুমি তাঁর কথার ওপর নির্ভর করতে পারো না। তাই আমি সুলতানের কাছ থেকে একটা হুকুমনামা বের করেছি। অবশ্য তোমার মত না নিয়েই।

—কী?

—তার আগে তোমার কাছ থেকে একটা কথা জেনে নিতে চাই। তুমি তোমার বাবার রাজ্যে ফিরে যেতে চাও?

—এতদিন পরে? না, বাবার ওপর আমার কোনওরকম শ্রদ্ধা নেই। তবে দেশটিকে আমি খুব ভালবাসি। কিন্তু এই পোড়ামুখ নিয়ে ওখানে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না।

—পোড়ামুখ কেন?

—সেকথা আপনি বুঝবেন না।

চিমনা বেগম একটু গম্ভীর হয়ে বলে—জানি, বিধর্মীর উচ্ছিষ্ট বলে। তোমার মা আমাকে বলেছিল একদিন।

—আপনি কীসের হুকুমনামা এনেছেন?

—আমি বিশ্বাস করি না, সামসুল হক ফিরে আসবে।

—আপনি হঠাৎ এই নাম উচ্চারণ করলেন কেন আজ?

—খিজির নামটা তো অনেক পরে দেওয়া হয়েছে সে ভাবী সুলতান বলে। আমি ওকে সামসুল বলেই ডাকতাম আগে। ও যদি কখনও ফিরে আসে, খিজির বলে ডাকব।

—আপনি বড় নিষ্ঠুর।

—সত্যিই কি তাই? একটু ভেবে দেখো। তবে আমি বাস্তবকে পাশ কাটাতে চাই না। শোনো, আমি ভাবলাম তোমার সবচেয়ে কাম্য হতে পারে সামসুলের সান্নিধ্য। তাই কাফুরের প্রবল প্রতিবাদের মধ্যেও আমি তোমার সেখানে যাওয়ার অনুমতি নিয়েছি।

এই অভাবিত সুযোগের কথা শুনে আমি কেঁদে ফেললাম। তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম।

চিমনা বেগম স্নেহভরা কণ্ঠে বলে—আমি তাহলে ভুল করিনি।

—না। খিজির যেখানেই থাকুক, তার পাশে থাকাতে আমার আনন্দ।

—তাহলে আজ মাকে গিয়ে দেখে এসো। তোমার অনুপস্থিতিতে তার কিছু এসে যাবে না। অথচ দুনিয়ায় তুমি ছাড়া কাউকে চায়নি সে। গুজরাট-মহিষীর কী পরিণতি।

—আমি গোয়ালিয়রে আমার বাঁদীকে সঙ্গে নিতে পারি?

—হ্যাঁ। এখানে তার আত্মীয়রা থাকে?

—তার কেউ নেই।

—নিয়ে যাও। সবাই বাঁদী নিতে পারে।

মাকে দেখতে গেলাম পরদিনই। বাঁদী আমাকে দেখে ভেতরে নিয়ে গেল। সেখানে দেখলাম আর একজন পরিচারিকা শশব্যস্ত হয়ে মাকে পোশাক পরানোর চেষ্টা করছে। মা একেবারে বিবস্ত্র। পরিচারিকাকে জব্দ করতে পেরে খুব আনন্দ তার। খিল্‌খিল করে হাসছে।

সবাই বলে, আঘাতের পর আঘাত পেলে মানুষের চোখের জল শুকিয়ে যায়। মানুষ বলতে নারী। পুরুষেরা এই পর্যায়ে পড়ে না। তবে খিজিরের চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হতে দেখেছি। মাকে দেখে আমারও হয়ত অশ্রুজলে নয়ন ভাসত। কিন্তু এই বয়সেও তার রূপ দেখে আমি স্তম্ভিত হলাম। লোকে বলে আমি রূপসী। সেই রূপ কোথা থেকে পেলাম আজ এই ঘোর দুর্দিনেও আমি বুঝতে পারি। এও বুঝলাম, রূপ আশীর্বাদের চেয়ে অভিশাপই বহন করে আনে নারীর জীবনে। মা দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখনও মুখে দুষ্টুমির হাসি। যেন চোদ্দ বছরের কিশোরী। স্তনদ্বয় এখনো উদ্ধত। ওই স্তনবৃন্তের আস্বাদ আমার জিভ কতটুকু পেয়েছে জানি না। মায়ের কটিদেশ, মায়ের উরু—সব কিছুতেই বিধাতার নিপুণ হস্তের প্রলেপ। বাবার প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী রূপসুন্দরী নাকি আরও সুন্দরী ছিল। এত সুন্দরী থাকতেও পৃথিবীকে অসুন্দর বলে জানে অধিকাংশ মানুষ। তারা শুধু অসুন্দরকেই দেখে। রাস্তাঘাটে যখন চলতাম একসময় তখন তো কোনও নারীকেই অসুন্দর বলে মনে হত না। কিছু কিছু অসুন্দর আছে বটে, কদাকার রয়েছে, বীভৎসও রয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে আবার রোগগ্রস্ত। আমার চোখের দৃষ্টি কি অন্য অনেকের মতো নয়? জানি না।

মা পালঙ্কের ওপর বসে পরিচারিকাকে হুকুম করে—আমাকে মেহেদি দিয়ে সাজিয়ে দে। আমি শিবমন্দিরে যাব। আমার দেবল খুব অসুস্থ।

আমি আর থাকতে পারি না। ছুটে গিয়ে বিবস্ত্র মাকে জড়িয়ে ধরে বলি—মা, এই তোমরা দেবল। আমাকে চিনতে পারছ না? আমার এই দুঃসময়ে যদি আমাকে না চিনতে পারো তবে কার কাছে সান্ত্বনা পাব? তুমি যে আমার জগৎটাকেই অন্ধকার করে দিলে।

মা থমকে যায়। আমার মুখখানা তুলে ধরে নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। তারপর বলি—না না, তুই না। তোর বাবা যখন আমার কাছ থেকে টেনে নিয়ে গেল তখনও তোর বাঁ হাতের তালুর কালো তিলের ওপর আমি শেষ চুমু এঁকে দিয়েছিলাম। আমাকে ফাঁকি দিতে পারবি না।

আশ্চর্য! এতদিন হারেমে এসেছি একবারও তো আমাকে একথা বলেনি মা! সত্যিই যে কালো তিল রয়েছে বাঁ হাতের তালুতে। আমি আর সহ্য করতে পারি না। মাকে বলি—এই দেখো মা, এই দেখ সেই তিল।

মা আগ্রহভরে চেয়ে দেখে। তারপর অবাক হয়ে আবার মুখের দিকে চেয়ে বলে

সত্যিই তুই দেবল? দেবল, কতদিন পরে তুই এলি। আজ আমার কী আনন্দ। আয়, বুকে আয়।

মায়ের আহ্বানে তার বুকে মুখ লুকোতে প্রলোভিত হলাম। পরিচারিকা সব দেখল। দেখুক। মা একটু স্থির হলে বলি—এবারে তুমি পোশাক পরে নাও মা। কেউ দেখতে পেলে লজ্জা পাবে না?

মা আমার কথা শুনে পরিচারিকার সাহায্যে একে একে সব পরে নেয়। ভাবি, মাকে এই অবস্থায় রেখে আমি কোথায় যাব? না গেলেও যে উপায় নেই। এ আমি কোন্ পরীক্ষায় পড়লাম?

তবু মাকে অনেকটা শান্ত করে আমি একসময় বলি—এবারে আমি যাই মা।

—কোথায়?

কী উত্তর দেব মাকে? আবার যদি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে! জানি আজই মায়ের সঙ্গে জীবনে আমার শেষ দেখা হয়ত। হয়তই বা বলব কেন? বিস্ময়কর কিছু না ঘটলে এটাই শেষ দেখা। কাঁদিয়ে তো যেতে পারি না মাকে? বরং প্রতারিত করে যাওয়া ভাল।

পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করি মায়ের খাওয়া হয়েছে কি না। সে বলল, সামান্য কিছু খেয়েছেন। একসঙ্গে বেশি কিছু খান না। অল্প অল্প করে দিতে হয়।

—তুমি ওকে একটু দেখো। দেখার কেউ নেই।

—জানি বেগমসাহেবা। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি।

—আমি বুঝতে পেরেছি।

মাকে বলি—আমার খিদে পেয়েছে মা। আমি খেতে যাচ্ছি।

—ও, কেউ তোকে খেতে দেয়নি? যা যা খেয়ে আয়। এখুনি যা। যা যা—

আমি কান্না চাপতে চাপতে বাইরে আসি। বাইরে এসে আজ প্রথম কথা বলি বাঁদীর সঙ্গে। আগে কখনও বলিনি।

—তুমি তো বরাবর মাকে দেখছ। যতদিন বেঁচে থাকে দেখো।

বাঁদী চোখের জল ফেলে বলে—আমি দেখব।

আমি চেয়েছিলাম অশ্বপৃষ্ঠে দ্রুত গোয়ালিয়রে পৌঁছতে। একথা শুনে আনোয়ারা বলে আপনি অবাস্তব কথা বলছেন বেগমসাহেবা। সুলতানের পরিবারের কোনও বেগম ওভাবে যাতায়াত করেন না। আপনাকে শকটেই যেতে হবে।

—তাতে তো দীর্ঘসময় লাগবে।

—উপায় নেই। আপনি অনুমতি পেয়েছেন এটাই ভাবতে পারছি না। চিমনা বেগমের অসাধ্য কিছু নেই। তা ছাড়া আমি তো ঘোড়ায় চড়তে পারি না।

অগত্যা একদিন শকটে উঠতে হল। মুনির এগিয়ে এসে সযত্নে আমার ওঠার ব্যবস্থা করে বারবার অভিবাদন জানাল। আমার মনের ভেতরটা রক্তাক্ত হতে থাকে। একদিকে খিজিরের কাছে যাওয়ার প্রবল বাসনা, অন্যদিকে মাকে ওই অবস্থায় ফেলে যাওয়ায়

আমি স্থির থাকতে পারি না। আমার শকটের পেছনে আনোয়ারার শকট। সে সেখানে উঠতে যাচ্ছিল।

আমি তাকে বললাম—তুমি এখানে এসো।

আনোয়ারা নিম্নস্বরে বলে—এখন নয় বেগমসাহেবা। রাজধানীর বাইরে গিয়ে আপনার শকটে আসব।

সেই কবে দেবগিরি ছেড়ে আমি এখানে এসেছিলাম। পথে দর্শনীয় অনেক কিছুই নিশ্চয় ছিল। কিন্তু আমি সেবার সেইসব উপভোগ করতে পারিনি। এখনও তাই। তবু খিজিরের কাছে যাচ্ছি বলে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করি। আমি জানি দেবগিরির চেয়ে গোয়ালিয়র অনেক নিকটে। কিছুদিনের মধ্যেই পৌঁছে যাব। আমার শকটের সামনে আর পেছনে অনেক সিপাহী রয়েছে। রাত্রিযাপনের জন্য তাঁবু রয়েছে।

পথের দুই পাশের গ্রামবাসীরা কর্মব্যস্ত। তবু তারা সুদৃশ্য শকট আর সিপাহীদের দল দেখে থমকে দাঁড়ায়। আগ্রহ ভরে চেয়ে থাকে। তবে খুব বিশেষ কৌতূহল নেই। দেবগিরির আশেপাশের পুরুষ ও রমণীদের সঙ্গে এদের অনেক মিল থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অমিলও রয়েছে। সেই অমিল, বর্ণে ও চেহারায়। কথা বলার সময় এদের ভঙ্গি এবং হাত-পা নাড়ারও কিছুটা প্রভেদ রয়েছে বলে মনে হয়। দেবগিরি অঞ্চলের মানুষদের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি বলে একথা বলতে পারছি। তবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার কৌতূহল আমার নেই।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমাদের শকটশ্রেণী একটি অনুচ্চ পর্বতের পাদদেশে এসে পৌঁছল। কৌতূহলী পাহাড়ী নারী-পুরুষ দূর থেকে দেখে আমাদের। তারা সিপাহীদের দেখে কাছে আসে না। তারপর অন্ধকার নেমে আসার আগেই ধীরে ধীরে চলে যায়। এইরকম কোনও জায়গায়, যদি খিজিরকে নিয়ে থাকতে পারতাম কত ভাল হত। আনোয়ারার সাদি দিত্ম তাহলে। ওকে দেখে বোঝার উপায় নেই ওর ব্যক্তিগত কোন কামনা বা বাসনা রয়েছে কি না। কিন্তু একজন নারী, যার দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় শোণিত স্রোতের ধারা বয়ে চলেছে অবিরত, সে কি কামনাহীন হতে পারে? সে কখনওই পাষাণ-প্রতিমা হতে পারে না।

পরদিন ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই আমার ঘুম ভেঙে যায়, সেই নন্দারবারের অভ্যাসেব মতো। অশ্বে চেপে রোজ বেরিয়ে পড়তাম। ফিরে এলে সতীমা মাঝে মাঝে মন্তব্য করত, "সূর্যের প্রথম রশ্মির সবটুকুই তো নিয়ে চলে এলে।" আমি একথার অর্থ বুঝতাম না। তারপর একদিন প্রশ্ন করায় বলেছিল "লাল টুকটুকে চেহারা আয়নাতে দেখলেই বুঝবে।"

আবার রওনা হলাম আমরা। দুদিকের দৃশ্য দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। সবকিছু বিস্মৃত হয়েছিলাম। এমনকী, খিজিরকেও। ডুবে গিয়েছিলাম বালিকা বয়সের আমিতে। সঙ্গে শুধু সতীমা। সূর্য যে কখন প্রায় মাথার ওপর উঠে এসেছে, খেয়াল

ছিল না। আনোয়ারার ডাকে সম্বিত ফিরল। আহারের সময় হয়েছে। এভাবে আজীবন অতীতে ডুবে থাকা যায় না? আমার মা পাগল হয়েও বর্তমানকে ভুলতে পারেনি। বড় বেশি যন্ত্রণা ভোগ করছে। যে কদিন বাঁচবে ওই যন্ত্রণা থেকে তার নিষ্কৃতি নেই। আমারও পাগল হতে আপত্তি নেই। তবে মায়ের মতো নয়। খিজিরকে ভুলে যাব, অল্প যন্ত্রণা ভোগ করব, তা কখনওই হয় না।

—কী ভাবছেন বেগমসাহেবা? খানা দিয়েছি অনেকক্ষণ।

—আচ্ছা আনোয়ারা, তোমার মনে কোনও বাসনা নেই?

—এ কী বলছেন বেগমসাহেবা? আমার বাসনা থাকবে কেন? হ্যাঁ, আছে একটা।

—কী?

—আপনাকে যেন ঠিকভাবে সেবা করতে পারি।

—একে কি বাসনা বলে? আমি সেই বাসনার কথা বলছি যা তোমার সম্পূর্ণ নিজের। যা তোমার একান্ত গোপন। সেই বাসনা পূর্ণ হোক, না হোক, কেউ কোনওদিন জানতে পারবে না।

অনেক ভেবে আনোয়ারা বলে—একটা বাসনা আছে।

—কী?

—বৃদ্ধ হওয়ার অনেক আগেই যেন আমার মৃত্যু হয়।

আমি স্তব্ধ হয়ে যাই।

—খেয়ে নিন বেগমসাহবা।

—তুলে রাখো। আমার ইচ্ছে নেই।

—না-না, না খেয়ে থাকবেন না। শরীর খারাপ হবে।

—আমি খেলে তোমার খুব আনন্দ হয়?

আনোয়ারা হেসে বলে—খুব আনন্দ হয় বেগমসাহেবা।

—কেন?

—এই দুনিয়ায় আপনার চেয়ে আমার আপন কেউ নেই বলে।

—তুমি আমাকে ভালবাসো?

—ওকথা বলতে নেই। আমি বাঁদী।

—ও। বাঁদীদের বুঝি কাউকে ভালবাসতে নেই।

আনোয়ারা চুপ করে থাকে।

—আচ্ছা আনোয়ারা কোনও পুরুষ যদি তোমাকে ভালবাসত?

সভয়ে আনোয়ারা চিৎকার করে ওঠে—বেগমসাহেবা—

—কী হল?

—আপনি এসব কী বলছেন?

—কী বললাম? খিজির যেমন আমাকে ভালবাসে, তেমন কোনও পুরুষ যদি তোমাকে ভালবাসে?

আনোয়ারা কেঁদে ফেলে। এই প্রথম ওকে আমি চোখের জল ফেলতে দেখলাম।

—কেঁদো না আনোয়ারা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে ওকথা বলিনি।

—জানি।

—অনেক বাঁদীরও সংসার রয়েছে।

—রয়েছে, তবে আমার সঙ্গে তাদের তুলনা করবেন না।

—কেন? তোমার জীবন কি আলাদা?

—হ্যাঁ।

—কীরকম আলাদা?

—ওসব কথা থাক বেগমসাহেবা।

—না, আনোয়ারা, এসব কথাই হবে। আমাদের যে অন্য কথা নেই।

—তেমন দিন যেন না আসে, আপনার যেন অনেক কথা থাকে। অনেক আনন্দের কথা। সুলতানজাদা ছাড়া গোয়ালিয়রে গিয়ে আর কাউকে তো পাবেন না। তখন আমাকেই বলবেন।

—কী জানি। সত্যিই কি আমার ভাগ্য তেমন হবে? গোয়ালিয়র সম্বন্ধে সবার কাছে শুধু ভয়াবহ কথাই শুনে এসেছি।

—সুলতানজাদার বেলায় তেমন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। স্বয়ং সুলতান বলেছেন আপনাদের কিছুদিন পরেই ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।

—তাহলে চিমনা বেগম এত ব্যস্ত হয়ে আমাকে খিজিরের কাছে পাঠাতে উদ্যোগী হলেন কেন? কিছুদিনের মধ্যে খিজিরের ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে আমাকে কি এভাবে পাঠাতেন?

আনোয়ারা এ কথার উত্তর দিতে পারে না।

—চুপ করে রইলে কেন? জবাব দাও।

আনোয়ারা আরও একটু চুপ করে থেকে বলে তেমন দিন যদি সত্যিই আসে, তাহলে আপনাকে বলব। কিন্তু তখন তো আপনার শোনার ইচ্ছে থাকবে না। তবু যদি শুনতে চান, আমি বলব।

শকটের চালক আর পাহারাদাররা বলাবলি করে - ওই যে গোয়ালিয়র কেল্লা।

কেউ প্রশ্ন করে—কোথায়? কোনটা?

—ওই তো, ওটাও দেখতে পাচ্ছ না?

—ওই পাহাড়ের ওপর?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি একবার এসেছিলাম।

—অত উঁচুতে?

—এমনিতেই কি আর বলে গোয়ালিয়র কেল্লা?

—গোয়ালিয়র মানে কি উঁচু?

আশেপাশের সবাই হেসে ওঠে। সবাই বলে—বুদ্ধু কোথাকার।

আমিও উঁকি দিয়ে দেখি। বেশ বড় কেল্লা। ওখানে খিজির রয়েছে। আমার বুকের মধ্যে ধুক্‌ধুক করে। ধুক্‌ধুক্ তো সব সময়ই করে। কিন্তু আনোয়ারা যদি নিজের শকটে না থেকে আমার এখানে থাকত, তাহলে আমার বুকের শব্দ শুনতে পেত। কিছুক্ষণ পরে অবশ্য স্বাভাবিক হলাম। কিন্তু এত কাছে এসেও যেন স্থির থাকতে পারি না। মনে হয় শকট থেকে ছুটে যাই ওখানে, নিজেও জানি যা অসম্ভব। কেল্লা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মানেই কাছে নয়। অনেক দূরে এখনও। তাছাড়া ওপরে উঠতে হবে। কী করে শকট নিয়ে উঠবে আমি জানি না। হয়ত সেইভাবে রাস্তা করা আছে। কিংবা ডুলি।

অনেকক্ষণ পরে অপরাহ্ণের কাছাকাছি আমরা কেল্লার প্রধান ফটকের কাছে এসে পৌঁছলাম। সেখানে অনেক রক্ষী। তারা খুব সাবধানে অনেক কিছু খুঁটিয়ে দেখল। তারপর আমাদের দুজনার সঙ্গে একজনকে দিল খিজিরের ঘর দেখিয়ে দিতে। সেখানে গিয়ে দেখি একজন রক্ষীর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন মাঝবয়সী স্বাস্থ্যবতী স্ত্রীলোক। সে আনোয়ারাকে প্রশ্ন করে—আপনি কে?

আনোয়ারা নিজের পরিচয় দেয়। সে ভেতরে ঢোকে। আনোয়ারাকে বলে—তুমি পাশের ওই ঘরে থাকবে।

—ওটার জানলা নেই?

—না। ওইখানেই তুমি থাকবে। বেগমসাহেবা ডাকলে তবে যাবে।

অগত্যা আনোয়ারা ওদিকে যায়। আমার কষ্ট হতে থাকে। মনে হয়, ওকে ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাচ্ছি। তা ছাড়া ওর ঘরে আলো বাতাস ঢোকে বলে মনে হয় না। ভাবনা হয় কী করে থাকবে। কিন্তু ও তো স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব স্বীকার করতেই আমার সঙ্গে এতদূর এসেছে। ওকে যে থাকতে দিয়েছে এটাই যথেষ্ট।

স্ত্রীলোকটি এবারে বলে—আপনার ওপর খবরদারি করার ভার আমার ওপর। আমার নাম বেকসুর।

ভাবলাম, অদ্ভুত নাম। এমন নাম থাকতে পারে ধারণা ছিল না। কিন্তু কতটুকু ধারণাই বা আছে এদের সম্বন্ধে। আমার অনেক কিছু জানার ইচ্ছা, কিন্তু একে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে না।

সামনে একটা ঘর দেখিয়ে সে বলে—ওইখানে সুলতানজাদা থাকেন।

—এখান থেকে বাঁদীকে ডাকব কী করে?

—বাঁদী তো ঘরের মধ্যে থাকবে না। সে এখানে বসে থাকবে একটা কিছুর ওপর। এদিক-ওদিক থেকে খুঁজে নেবে।

ঘরে ঢুকি। একী! এও যে প্রায়ান্ধকার। বেশ বড় ঘর। অনেক উঁচুতে দু-তিনটে জানলা। বলি—খিজির কোথায়?

স্ত্রীলোকটি বুঝতে পারে না।

বলি—সুলতানজাদা?

—ওই যে। কেউ এলেই উনি ওদিকে মুখ করে পালঙ্কের ওপর বসে থাকেন। আপনি যে আসবেন, ওঁকে তো বলা হয়নি।

—কেন?

—কিল্লাদার প্রয়োজন বোধ করেননি। বোধহয় হুকুম ছিল না সুলতানের।

আমি মুহূর্তের মধ্যে মুষড়ে পড়লাম। বুঝলাম, খিজির এখানে অন্যান্যদের মতো সাধারণ পর্যায়ের একজন বন্দী মাত্র।

আমি কঠিন স্বরে বলি—এবারে তুমি যেতে পার।

আধা-অন্ধকারের মধ্যেও তার সাদা দাঁতগুলো বেরিয়ে পরে। সে বলে—না। আগে দেখি সুলতানজাদা আপনাকে চিনতে পারেন কিনা।

—সুলতানজাদা এখানে বেশিদিন থাকবেন না। তিনিই ভাবী সুলতান। এটা মনে রেখো।

স্ত্রীলোকটি বিশ্রীভাবে হাসতে থাকে। ওর হাসি দেখে আমার ভয় হয়।

সেই সময়ে সুলতানজাদা ওর হাসি শুনে পেছনে ফেরে। ওকে দেখে আমি চমকে উঠি। একী চেহারা হয়েছে? অত সুন্দর স্বাস্থ্য, এর মধ্যেই এমন দশা? তেমন আলো নেই বলে ঠিকভাবে বুঝতে না পারলেও ওর মুখের সেই রক্তিম আভা আর নেই।

স্ত্রীলোকটি বলে—আপনার বেগমসাহেবা।

বলেই সে মুহূর্তের মধ্যে পেছন ফিরে দ্রুত চলে যায়।

খিজির তবু আমার দিকে চেয়েই থাকে।

আমি ওর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব ভেবেছিলাম। কিন্তু ওর স্বাস্থ্য দেখে ভয় হল। রুদ্ধ কণ্ঠে বলি—কী হল খিজির? আমাকে চিনতেও পারছ না?

—তুমি দেবল তো। তুমি এখানে আসবে কী করে? শেষে আমার মাথাটাও খারাপ করে দিল কাফুর।

—তোমার মাথা একটুও খারাপ হয়নি। আমি এসেছি তোমার কাছে। চিমনা বেগম অনেক কষ্টে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমি যে থাকতে পারছিলাম না।

—কিন্তু ওরা যে মাঝে মাঝে এসে বলত, আর দেখা হবে না?

—ওদের ক্ষমতা কতটুকু? এই কেল্লার বাইরে ওরা কিছু নয়। বন্দীদের ওপর যত জুলুম। দেখলাম, তোমাকেও বাদ দেয় না।

খিজির এতক্ষণে একটু স্বাভাবিক হয়। বলে—দেবলরানী, তুমি আমার কাছে এসেছ? আমার দেবল, আমি যে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। তোমাকে দেখলে মুহূর্তে তোমাকে কাছে টেনে না দিয়ে পারতাম না। এখনও ভাবছি, এসব বুঝি স্বপ্ন।

আমি ওকে জড়িয়ে ধরে বারবার বলি—এবারে বিশ্বাস হচ্ছে তো? এবারে? এবারে? ওর চোখে মুখে কপালে অজস্র চুমু এঁকে দিই।

এতক্ষণে মনে হল, খিজিরের দেহের স্তব্ধ শোণিত-ধারা আবার বইতে শুরু করল।

ও আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর চুম্বন করে। এবারে আমার চোখ নিমীলিত হয়। যা করার ও করুক। আমার আর করার কিছু নেই।

খিজিরের পোশাকে অস্বাস্থ্যকর গন্ধ। ওর শরীরের মাংসপেশীও যে আগের মতো মজবুত নয় তাও বুঝতে অসুবিধা হল না।

—তুমি কী খাও এখানে?

এতক্ষণে একটু হেসে বলে—সুলতানী খানা কখনওই নয। তবে দেয়। না খাইয়ে রাখে না।

—তোমার পছন্দমতো খানা পাও না?

—তুমি পাগল হলে? আমি এখানে বন্দী।

—সে তো কিছুদিনের জন্যে। সুলতান তো তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। তখন তুমি এদের শাস্তি দিও।

—দেবল, এর মধ্যে আমি অনেক কিছু বুঝে গিয়েছি। তুমি ধরে নিতে পারো, আমি সারাজীবনের মতো এখানে থেকে যাব।

—কী বলছ তুমি! সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী বেঁচে থাকতে?

—সেটাই প্রশ্ন। সুলতান কি বেঁচে থাকবেন বেশিদিন?

—কেন থাকবেন না। এখানে থেকে থেকে তোমার মধ্যে একটা হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। সব কেটে যাবে। তুমি শিগ্‌গিরই ফিরে যাবে।

—না দেবল। কয়েকজন অক্ষম মানুষের উচ্চাশা আর অতিরিক্ত লোভ তা হতে দেবে না। তাদের মধ্যে কাফুর যে সবচেয়ে আগে, একথা তুমি নিশ্চয় জান।

—জানি। কিন্তু সুলতান তা হতে দেবেন না।

—আমার ভয় হয়। তাঁকে ওরা মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আমি শেষ যেদিন তাঁকে দেখি তখন বুঝতে পারি তাঁর সেই মনের জোর, তাঁর ব্যক্তিত্ব, কিছু নেই। তিনি কার্যত কাফুরের হাতের পুতুল। তার বিরুদ্ধে যাওয়ার তাঁর কোনও ক্ষমতা নেই। অথচ তিনি আমাকে আগের মতোই ভালবাসেন। বিদায় নেওয়ার সময় আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিলেন। তখনই বুঝেছিলাম, আমি আর ফিরব না। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আশাও ছেড়ে দিয়েছিলাম। শুধু প্রার্থনা করতাম, তুমি যেন ওদের হাতে না পড়ো। আজ তাই আমার আনন্দের দিন।

—না, এত সামান্যতেই তোমার আনন্দ শেষ হতে পারে না।

আনোয়ারা মাঝে মাঝে আমাদের ঘরে আসে। তাকে বলা হয়েছে, যখন তখন সে ভেতরে ঢুকতে পারে। খিজিরের মধ্যে আগের উচ্ছ্বাস আর নেই। তাই উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে আমরা দুজনা নানা ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে ওর কাছে ধরা পড়ে লজ্জিত হব না। খিজিরের মধ্যে সেই উদ্যম যদি ফিরিয়ে আনতে পারি, তাহলে ধরা পড়তেও অমি রাজি। তেমন কিছু দেখলে আনোয়ারাও খুশি হবে এবং তারপর থেকে জানিয়ে শুনিয়েই ঢুকবে।

কিন্তু একমাস হতে চলল, তেমন তো কিছু দেখলাম না। শুধু সব সময় অনুভব করি খিজির আমাকে কত গভীরভাবে ভালবাসে। আমি ওকে যতটা ভালবাসি তার চেয়েও অনেক বেশি। আমাকে একবার ফিরে পেয়ে এখন যদি আবার আমাকে হারায়, তাহলে ও কিছুতে বাঁচবে না। একথা আমি বুকে হাত দিয়ে চলতে পারি। কিন্তু আজ যদি ওর সত্যিই তেমন কিছু হয়, আমি মরব না। আমি যে নারী। নারীরা মরে না। শুধু সুখ-দুঃখের স্মৃতি বয়ে বেড়ায় জীবনের বাকি সময়। আমার মা তারই এক শোচনীয় নিদর্শন।

আমাদের দুজনকে ঘরের বাইরে খোলা অলিন্দে ঘোরার অনুমতি দিয়েছে ওরা। খিজির জানত সেকথা। তবু সে ঘরের মধ্যে বসে থাকে। আমি বলি—একথা তুমি আগে বল্লোনি কেন?

—ইচ্ছে করেনি।

—কী ইচ্ছে করেনি?

—বাইরে যেতে।

—তাই বলে এইভাবে ঘরের মধ্যে বসে থাকবে? তাই তুমি এত ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছ। তাই তোমার কোনও উদ্যম নেই।

—কী হবে?

—পুরুষ মানুষকে এভাবে হতাশ হলে চলে? আজই একটু পরে তোমাকে বাইরে হাঁটতে হবে আমার সঙ্গে।

—সঙ্কোচ হয়। ওরা দেখবে আর মনে মনে হাসবে। বলবে, ওই যে, সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর পরের সুলতান পায়চারি করছে। কেউ কেউ হয়ত এসে ব্যঙ্গ করে সেলাম জানাবে।

আমি ওর মানসিক অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে যাই। নির্বান্ধব জায়গায় একা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থেকে পাগলামির পূর্ব অবস্থায় এসে পৌঁছেছে কি না কে জানে।

—তোমাকে সুলতান হতেই হবে খিজির। এবারে ভেঙে পড়লে চলবে না।

—কী করে?

—গোয়ালিয়র কেল্লা থেকে পালাতে হবে।

—কী বলছ তুমি দেবল? এই কেল্লার ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটেনি।

—যা ঘটেনি তাই ঘটবে। তুমি ইতিহাস সৃষ্টি করবে।

—কী করে?

—কেল্লাদারকে উৎকোচ দিয়ে।

খিজির অদ্ভুতভাবে হেসে ওঠে। বলে—এইবারে তুমি একটা পরামর্শ দিয়েছ বটে। উৎকোচ পাব কোথায়?

—তোমার চেয়ে ভাল উৎকোচ দেওয়ার ক্ষমতা কার আছে?

—আমি তো কপর্দকশূন্য।

—না, তোমার চেয়ে সম্পদশালী কেউ নয়। তুমি কেল্লাদারকে বলবে, এই কাজ করলে সুলতান হয়ে তুমি ওকে রাজধানীতে নিয়ে গিয়ে যে তিনচারজন প্রধান থাকে, তাদের একজন করে দেবে। ওকে আর এইখানে নির্বাসিত হয়ে থাকতে হবে না। ওর পরিবারের অনেকেই অনেককিছু সুবিধা পাবে।

খিজিরের চোখের দৃষ্টির মধ্যে যেন একটু আশার আলো দেখতে পেলাম। সে বলে—তেমন চেষ্টা করা যেতে পারে। আমার মনে হয় না, লোকটা কাফুরের আজ্ঞাবহ্। কাফুর আর যাই হোক, তার দূরদৃষ্টি আছে বলে মনে হয় না। আমাদের দুর্ভাগ্য সুলতান তার খপ্পরে পড়েছেন।

—তবে?

বহুদিন পরে খিজির সূর্যের আলোয় এসে দাঁড়াল। সে প্রথমে ভাল করে তাকাতেই পারে না। হাত দিয়ে আলো আড়াল করার চেষ্টা করে। তারপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়। তাকে প্রথম বাইরে দেখে বুঝলাম সে কত কৃশ হয়ে গিয়েছে। অবশ্য যেভাবে সে খাওয়া-দাওয়া করেছে এখন তার কিছুই পায় না। তবু এইভাবেই তাকে অভ্যস্ত হতে হবে। বেঁচে থাকার জন্য স্বাস্থ্য তাকে ফিরে পেতেই হবে।

কিছুদিনের মধ্যেই খিজির আবার অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে গেল। এমনকী আগের সেই দুষ্টুমিও মাঝে মাঝে দেখা যেতে লাগল। একদিন তো আনোয়ারার কাছে ধরাই পড়ে গেলাম। সে বেচারার অবস্থা দেখে আমার কষ্ট হল। খানিক পরে আবার সে জানান দিয়ে এল। তার চোখে মুখে উৎসাহ। আমাকে একান্তে বলে—সুলতানজাদাকে অনেকটা সুস্থ দেখে আমার খুব ভাল লাগছে।

—হ্যাঁ আনোয়ারা, ও ভাল থাকলেই আমরা ভাল থাকব।

এইভাবে বেশ কিছুদিন চলল। খিজির যেন প্রায় আগের খিজির। সে বলে, এবারে কেল্লাদারকে একবার বলা যেতে পারে। কিন্তু সে যদি আমার প্রস্তাবে রাজি না হয়, তাহলে চিরকালের মতো আমার আশা শেষ হয়ে যাবে।

—নানা কথা বলে তার মনোভাব বুঝে নাও।

—কী করে বুঝব? সে জানে, যারা এখানে আসে তাদের খাতির করার কোনও কারণ নেই। তুমি তো দেখছই আমার কাছে কত কম আসে। ব্যবহারও লক্ষ্য করেছ।

—এবারে এলেই তাকে আসল কথা বলে ফেলবে। ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই। সময় চলে যাচ্ছে।

—হ্যাঁ ওদিকে কাফুর যে কী করছে জানি না। দিল্লির খবর এখানে আসেও দেরিতে। তা ছাড়া আমাকে সব কিছু জানানোর প্রয়োজন বোধ করে না।

দুদিন পরেই দুর্গাধ্যক্ষ এল। খিজির তাকে ঘরের ভেতরে আহ্বান করে। সে একটু অবাক হয়। ঘরে খিজিরের বেগম আছে সে জানে। বেগমের জন্য ঘরের লাগোয়া অন্য কোনও ঘর অন্তত খিজিরকে দেওয়া হয়নি। সে ইতস্তত করে।

খিজির বলে—আসুন, আমার বেগমসাহেবা ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে থাকবেন।

সে ঢুকে অপ্রস্তুত অবস্থায় দাঁড়ায়। খিজির বন্দী হলেও সে সুলতান আলাউদ্দিনের পুত্র। খিজির তখন তাকে বহু আলোচিত প্রস্তাবটি জানায়। আমি আশঙ্কা করেছিলাম কেল্লাদার ক্ষিপ্ত হবে। কিন্তু সে স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলে—আমি সুলতানের বিশ্বস্ত। আর বিশ্বস্ত বলেই তাঁর কোনও হুকুম আমি অমান্য করি না। কাফুরকে আমি কোনওদিনও পছন্দ করি না। তবু আমার উপায় নেই। আপনার কথা শুনে বুঝতে পারছি কাফুরের চক্রান্তে আপনাকে এখানে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সুলতানের ফরমানকে আমি অমান্য করতে পারি না।

—আমার কথা কি তুমি বিশ্বাস করলে না?

—করেছি। তবু আমাকে অন্তত সাতদিন সময় দিন। আজ যেকথা আমাকে জানালেন, আসার পরই যদি বলতেন, তাহলে বড় ভাল হত।

—তখন তো এখানকার হালচাল জানতাম না।

—ঠিক আছে সুলতানজাদা, আমি দেখছি।

সে চলে যেতেই খিজির আমাকে তুলে ধরে ঘুরপাক খেতে থাকে। বলি—ছেড়ে দাও, মাথা ঘুরছে। আনোয়ারা এখনি এসে পড়বে।

খিজির আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলে—কীভাবে যাব কেল্লাদারেব সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

—যা করার দ্রুত করতে হবে।

কিন্তু সাতদিন শেষ হওয়ার আগেই এক সর্বনাশা সংবাদ এসে পৌঁছল গোয়ালিয়ারে। সুলতান আলাউদ্দিন মৃত। তাঁর মসনদে বসেছেন শিহাবুদ্দিন উমর খিল্‌জী। তিনি সুলতানের কনিষ্ঠ পুত্র। অন্যান্য পুত্রদের সুলতান কাফুরের চক্রান্তে আগেই বন্দী করেছেন। খিজির একেবারে ভেঙে পড়ল। আমি বুঝলাম, তার ভাগ্য চিরকালের মত নির্বাসিত হয়ে গেল।

কেল্লাদার গম্ভীর হয়ে এসে জানাল—আপনি যদি এসেই আমাকে জানাতেন ভাল হত। আজ থেকে আমার হাত-পা বাঁধা। নতুন সুলতানের নাম আমি কখনও শুনিনি। কিন্তু এই খবর পৌঁছনোর একটু আগে আর একজন এসেছে দিল্লি থেকে। তাকে আমি একদিন বসিয়ে রেখেছি। কিন্তু আর পারব না। আজই তাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। কারণ তার সঙ্গে রয়েছে স্বয়ং সুলতান আলাউদ্দিনের আংটি।

খিজির বলে—কিন্তু তিনি তো মৃত।

—তা হোক। আমি অমান্য করতে পারি না।

—কেন পাঠিয়েছিলেন সুলতান?

—জানি না।

—তাহলে পাঠিও না। সে আমাকে মেরে ফেলতে পারে।

—পারে হয়ত।

—তুমি কী বলছ? নাম কী লোকটার?

—সাম্বল।

—কখনও শুনিনি তো।

—আমিও শুনিনি। কিন্তু সুলতানের আংটি রয়েছে।

—আমার মনে হচ্ছে ও সাংঘাতিক কিছু একটা করতে এসেছে। তুমি পাঠিও না।

—সুলতান আলাউদ্দিনের শেষ হুকুম। আমি মানতে বাধ্য।

—কিন্তু তুমি তো বুঝছ তিনি হয়ত অচেতন অবস্থায় ছিলেন। হয়ত সেই অবস্থায় তাঁর আংটি খুলে নেওয়া হয়েছে।

—আমি সামান্য কেল্লাদার, অত কিছু দেখি না।

—তুমি এভাবে পাল্‌টে গেলে?

—আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। কাফুর খেপে গিয়েছে, যা খুশি করছে। ছয় বছরের শিশুকে মসনদে বসিয়ে তার মাকে বেগম বানিয়েছে।

—তোমার কি মাথা খারাপ? কাফুর তো খোজা।

—আমার মনে হয় তার সুলতান হওয়ার সাধ হয়েছে। নতুন সুলতানের পরমায়ু কতদিন কে জানে?

—আমি সুলতানজাদা। তোমার কাছে আমার শেষ অনুরোধ ওকে পাঠিও না।

—না পাঠালে আমার কী অবস্থা হবে?

—আমি তোমার ব্যবস্থা করব। ফিরে গেলেই সব কিছু অন্যরকম হয়ে যাবে।

কেল্লাদার অদ্ভুতভাবে হেসে ওঠে। বলে—আমার জীবন নিয়ে আপনি ছিনিমিনি খেলতে চান? তোফা। এই না হলে ভাবী সুলতান? আপনি মসনদে বসলে আমার মতো অনেকের দুর্দশার শেষ থাকবে না। এই আপনাকে শেষ সেলাম জানাচ্ছি। আপনি বেঁচে থাকলেও কোনওদিন আর আপনাকে কোনও সম্মান দেখাব না।

কেল্লাদার দ্রুত কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়।

খিজির আমাকে বলে—কী নাম বলল লোকটার?

—সাম্বল।

—কোনওদিন এই নাম শুনিনি।

কদিনের অনিদ্রায় আর মানসিক চাপে আমি এমনিতেই সুস্থ ছিলাম না। আজ কেল্লাদারের ব্যবহারের আকস্মিক পরিবর্তনে আমি দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। আমার মুখ ফস্‌কে বের হয়—কয়জন জল্লাদের নাম তুমি জান খিজির?

খিজিরের চোখে আতঙ্কের দৃষ্টি। বড় বড় চোখে সে তাড়াতাড়ি দুপা ছুটে এসে আমাকে বলে—না না। আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারব না। না—

একটু পরেই একজন লোক ভেতরে ঢোকে। কেল্লাদার দরজার সামনে একটু দাঁড়িয়েই মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। বোঝা গেল সে থাকতে চাইল না। খিজিরের মুখ রক্তশূন্য।

লোকটা একটা আংটি ডানহাতের দুই আঙুলে তুলে ধরে অদ্ভুত হেসে সেটাকে নাচাতে নাচাতে বলে—এই আংটি চিনতে পারেন সুলতান-জা-দা?

ওই আংটি আমিও দেখেছি সুলতানের ডানহাতের মাঝের আঙুলে। হীরে বসানো।

খিজির চুপ করে থাকে। লোকটার হাতে কোনও অস্ত্র না থাকায় আমার একটু ভরসা হয়। হয়ত অন্য কোনও খারাপ খবর দেবে।

সে খিক্‌খিক্ করে কুৎসিত হেসে বলে—আমি আপনার পরের ভাই শাদিখাঁয়ের ওখান থেকে এসেছি। তিনিও বন্দী, জানেন না? ওখান থেকে কাজ শেষ করে এলাম। এখানকার কাজটা সেরেই রাজধানীতে ফিরে যেতে হবে। আরও কত কাজ বাকি কে জানে। কাফুর তো একসঙ্গে সব বলে না। নিন্ বসুন। কোথায় বসবেন? এই মেঝেতেও বসতে পারেন।

—কী করবে?

—আগে বসুন। ওহো, ভুলেই গিয়েছিলাম। আপনার বেগমসাহেবাকে একটু সরে যেতে বলুন। পুরুষদের কাজ। উনি এসবের মধ্যে না থাকাই ভাল।

—উনি থাকবেন।

—খুব ভাল কথা। আমার আপত্তি নেই।

আমরা দুজনেই বুঝতে পারি না কী উদ্দেশ্যে ও এসেছে। শাদির ওখানেও গিয়েছিল। শাদিও বন্দী। সব কিছু হয়েছে সুলতানের মৃত্যুর পর। আর সবারও নিশ্চয় একই অবস্থা। কিন্তু সেসব আমার মাথায় নেই। আমার নির্নিমেষ দৃষ্টি ওই লোকটার ক্রূর চাহনি আর শয়তানী হাসির দিকে।

—তাহলে শুরু করি?

লোকটা সহসা তার কোমরের পাশ থেকে তীক্ষ্ণ একটা হাতল লাগানো সুচ বের করে বলে—এটা আমি নিজে বসে থেকে বানিয়েছি। আমার ওপর হুকুম এটি আপনার দুই চোখের মণির মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে।

খিজির চিৎকার করে ওঠে—তুমি আমাকে অন্ধ করে দেবে?

—আপনার ভাইও এখন হাতড়ে চলেন। বসুন। আমার ওপর সেইরকমই আজ্ঞা।

—না। আমি তাহলে সুলতান হতে পারব না।

—সেইজন্যেই তো এই ব্যবস্থা। বসুন।

আমি বলে উঠি—না না।

—আপনি চলে যান বেগমসাহেবা। এর মধ্যে আপনি থাকবেন না।

খিজির ছিট্‌কে দূরে সরে যায়। লোকটা বলে ওঠে—কোনও লাভ নেই। আপনাকে ঠাণ্ডা করে রাখার ব্যবস্থা করা আছে।

—না।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা দিয়ে চারজন লোক ভেতরে ঢুকে এগিয়ে আসে।

খিজির চিৎকার করে ওঠে—তোমরা কারা? কেল্লার কেউ হলে শোনো, ও আমাকে অন্ধ করে দিতে এসেছে।

ওরা কিছু না বলে গায়ের জোরে খিজিরকে ধরে বসিয়ে দেয়। লোকটা একটুও দেরি না করে তার দুই চোখে সুচ ঢুকিয়ে বের করে নেয়। খিজিরের সেই প্রথম চিৎকার আমার কানে আজও বাজে। বুক কেঁপে ওঠে।

খিজির কেঁদে বলে ওঠে—দেবল, কাফুর আমাকে সুলতান হতে দিল না।

ওর চোখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বের হয়ে আসছিল।

ওরা নির্বিকার চিত্তে চলে যায়। আমি খিজিরের পাশে বসে প্রথমে তার রক্ত মুছিয়ে দিই। আমার অশ্রু অবিরল ধারায় গড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু খিজিরের হাহাকার আমার কণ্ঠরোধ করে দিয়েছিল।

—আর তোমার মুখ দেখতে পারব না দেবল। আমি সুলতানী না পেলেও দুঃখ ছিল না। তোমার মুখ দেখতে পারতাম। সেটাই আমার সান্ত্বনা ছিল।

—অমন করতে নেই। শান্ত হও। তোমার ভাইদের কথা ভাবো তো। তাদের দেবলও নেই।

—হ্যাঁ দেবল, তারা আরও অভাগা।

একটু পরে কেল্লার হাকিম এল। চোখে কীসব দিয়ে দুই চোখ বেঁধে দিয়ে বলল, কাল এসে খুলে দিয়ে যাব। খুব বেশি ব্যথা হলে এই বড়ি একটা খাইয়ে দেবেন। ঘুমিয়ে পড়বেন। দুটো খেলে কিন্তু সেই ঘুম আর ভাঙবে না।

হাকিম আমার হাতে ছোট্ট কৌটো দিয়ে গম্ভীরভাবে চলে গেল। সুলতান আলাউদ্দিনের পুত্রকে বিন্দুমাত্র সম্মান দেখাল না।

সে চলে যেতেই আনোয়ারা ছুটে এল। খিজিরের এই অবস্থা দেখে সে ডুকরে কেঁদে ওঠে। সে বলে—ওরা আমাকে বেঁধে রেখেছিল আমার ঘরে। আসতে দেয়নি।

—আনোয়ারা, তুমি কবে ছেড়ে যাবে আমাকে?

—ছেড়ে যাওয়ার তো কথা ছিল না বেগমসাহেবা। কিন্তু সেকথা না ভেবে সুলতানজাদার পোশাক ছাড়িয়ে দিতে হবে।

খিজিরের পোশাক রক্তাক্ত। আনোয়ারা নিঃশব্দে কাঁদতে কাঁদতে আর এক প্রস্থ পোশাক এনে আমার হাতে দিয়ে বলে—একটু পরে আসব।

আমাদের চত্বর যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে দরজায় সিপাহী মোতায়েন থাকে। তার পাশে আর একটা দরজার ওপাশে আর একটা চত্বর। সিপাহী দুদিকেই নজর রাখতে পারে। একদিন ভোর হতে না হতেই সেখানে চেঁচামেচি শুরু হল। আমি ঘরের বাইরে এসে দেখি আনোয়ারা প্রাচীরের গায়ে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে রয়েছে। বুঝলাম সে যতটুকু বুঝবে আমাকে এসে জানাবে। তাই সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘরে ফিরি। আমি কাছে না থাকলে খিজির ছট্‌ফট্ করে। প্রথম দুদিন খুব কেঁদেছিল শিশুর মতো। এখন কাঁদে

না। কিন্তু আমি কাঁদি, নিঃশব্দে কেঁদে চলি। ওর সুন্দর ভাসা ভাসা চোখ আর নেই। সেখানে কী রয়েছে আমি দেখার চেষ্টা করিনি দুদিন। তারপর দেখতেই হয়। নইলে সেবা করবে কে? চোখের দুই মণির মধ্যে ক্ষত? তবে যে কারণেই হোক এই পনেরো বিশ দিনে ওর যন্ত্রণা কিছুটা কমেছে।

আনোয়ারা এল। বেশ উত্তেজিত বলে মনে হল। সে একবার খিজিরের দিকে চেয়ে ইসারায় আমাকে জিজ্ঞাসা করে ওর সামনে বলবে কি না। আমি ঘাড় কাত করি। কারণ আমি বুঝে গিয়েছি খিজিরের সব কিছু বিষয়েই এখন আগ্রহ কমে আসছে। সে শুধু আমার কাছে থাকতে চায়।

আনোয়ারা বলে—আর এক সুলতানজাদাকে আনা হয়েছে।

খিজির হঠাৎ সজাগ হয়ে ওঠে—কে? কী বলল আনোয়ারা?

—ওকে বলতে দাও।

—হ্যাঁ বলুক।

—সুলতানজাদা শাদি খাঁকে আজ আনা হয়েছে। ওঁকে অনেক আগেই বন্দী করে রাখা হয়েছিল। উনি খুব চিৎকার চেঁচামেচি করছিলেন।

—বেচারা। তুমি দেখ নিও দেবল, এবারে ওকেও অন্ধ করে দেওয়া হবে।

—উনি অন্ধ। ওঁর চোখের মণিতে সূচ না ঢুকিয়ে সবটা ছুরি দিয়ে চেঁচে নেওয়া হয়েছে। শুনলাম শুধু দুটো গর্ত সেখানে।

শুনে খিজির কেঁদে ওঠে। আনোয়ারা তো বটেই, আমিও অবাক হয়ে যাই। ভাই-এর ওপর এত টান থাকে নাকি সুলতানজাদাদের? তাই প্রশ্ন করি—কাঁদছ কেন?

—কাঁদব না! খুব ছোটবেলায় ও সব সময় আমার পেছনে পেছনে ঘুরত। আমার কোন কিছুতে আনন্দ হলে ওরও হত। তারপর তেরো চোদ্দো বছরের পর ওর কিছু কিছু বন্ধু জুটে যায়। সেই সময় থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। তবু কখনও আমার বিরুদ্ধে কোনও কথা বলেনি। মনে মনে ভালবাসা ছিল নিশ্চয়। ওর গায়ে খুব শক্তি। এরা ওকে কাবু করল কী করে? যদি ওকে কাছে পেতাম সান্ত্বনা দিতাম। ছেলেবেলার কথা মনে করিয়ে দিয়ে ওকে ভুলিয়ে রাখতাম।

আনোয়ারা স্তব্ধ হয়ে শোনে। আমিও। এইরকম যার মন, সে সুলতান হত কী করে? সারাদিন খিজির শুধু ছট্‌ফট্ করে আর বলে, ওর কাছে একবার যাওয়া যায় না? সেটুকু অনুমতিও কি ওরা আমাকে দেবে না?

—তুমি বুঝতে পারছ না কেন খিজিরও সুলতানের মৃত্যুর পরে তোমাদের ওরা আর মানুষ বলে ভাবে না। তোমরা হলে এক একটা কয়েদী। তোমাদের নিজেদের ইচ্ছা সাধ কিছুই থাকতে নেই। তোমাদের রোগ যন্ত্রণা থাকতে নেই। রোজকার খানা খেয়ে বুঝতে পারো না?

কিছুদিন পর আর এক সংবাদ এল রাজধানী থেকে। একে দুঃসংবাদ না বলে সুসংবাদই বলব। ঘটনা ঘটে গিয়েছে অনেক আগে। খবরটা এসে পৌঁছল দেরিতে। এবারও সেই

আনোয়ারা। তার প্রধান কাজই হয়ে দাঁড়িয়েছে বন্ধ দরজার ওপাশে প্রহরারত সিপাহীর সঙ্গে ভাব জমানো। আমি একদিন তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তুমি কী করে ভাব করো?

সে হেসে বলেছিল—কিছু মনে করবেন না বেগমসাহেবা, আমি দেখতে যেমনই হই আমার হাসিটা মিষ্টি। ছেলেবেলায় সবাই বলত একথা। মেয়েদের মিষ্টি হাসিতে অনেক কাজ হয়। জানি ওদের অধিকাংশই বাড়িতে বিবিদের মুখঝামটা খেয়ে আসে। এই দীর্ঘ একঘেয়ে কাজে আমার হাসি ওদের মধ্যে বৈচিত্র্য আনে। কাজ হয়।

ওব কথা শুনে আমি থ' হযে যাই। তাবপব বলি, দেখো, যেন ওদের দুঃখে বেশি বিগলিত হয়ো না।

আনোয়াবা হেসে ফেলে বলে—এই ধর'নেব কাজ করার কথা ভাবতেও আগে আমার ঘৃণা হত। কিন্তু এখন আমি অবস্থার গতিকে বেশরম হয়ে পড়েছি।

—তাহলে তো চূড়ান্ত বেসরমও হতে পার তুমি।

আনোযারা একটু চুপ করে থাকে। তারপর গম্ভীর হয়ে বলে—যদি আপনাদের দুজনার মুক্তি হয় তাতে, তাহলে আমি তাও পারি।

আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠি—আনোয়ারা—

খিজির কক্ষের ওই প্রান্ত থেকে বলে—কী হল? তোমার ব্যথা লেগেছে দেবল? দাঁড়াও।

খিজির উঠে হাতড়ে হাতড়ে আসার চেষ্টা করে, আমি বলে উঠি—এসো না, আমার কিছু হয়নি।

আনোয়ারা আজকাল সোজাসুজি খিজিরের সঙ্গেও কথা বলে অনেক সময়। সে বলে—একটা ভাল সংবাদ পেয়েছি। কিন্তু সেই সংবাদে আপনার বিশেষ কোনও উপকার হবে বলে মনে হয় না। তাই এতক্ষণ তেমন উৎসাহ পাইনি।

খিজির বলে—ভাল সংবাদ সব সময়েই ভাল। তাতে আমার কতটা উপকার হল সেটা বড় কথা নয়।

—সুলতানজাদা, কাফুর খুন হয়েছে।

—কী বলছ আনোয়ারা! এ তো খুবই সুসংবাদ। কবে এমন হল?

—আপনার ছোটভাইকে মসনদে বসানোর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ঘটে গিয়েছে এটা।

—কে এই কাজ করল?

—আমাদের এখানকার পাহারাদার তাকে চিনতে না পারলেও আমি চিনি। আমরা তাকে চিনি। পাহারাদার তার নামটা শুধু জেনেছে।

—কে সে?

—মুনির।

আমি বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলি—মুনির? যে কসর-ই-লালে—

—হ্যাঁ বেগেমসাহেবা, আপনার অনুমান সঠিক।

—সে তো প্রতিজ্ঞা করেছিল, কাফুরকে শেষ করবে।

—হ্যাঁ, সে তার প্রতিজ্ঞা পূরণ করেছে।

—আশ্চর্য!

খিজির আবার উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সে বলে—কিন্তু শিহাবকে কে চালাবে? ওকে তো আমিও ভাল করে চিনতাম না।

আনোয়ারা বলে—তিনি তো আর সুলতান নেই।

—নেই? কী হল তার? কে সুলতান হয়েছে? খিলজী বংশ শেষ হয়ে গেল?

—না, আপনার আর এক ভাই। মুবারক।

খিজিরের চোখে মুখে আনন্দ প্রকাশ পায়। সে বলে—খুব ভাল। খিলজী বংশ টিকে গেল অন্তত। তবে সে আমার সহোদর নয়। তা হোক।

আমি বিরক্ত হয়ে বলে উঠি—কী হবে তোমার খিলজী বংশ টিকলে? কোনও সুরাহা হবে?

—তুমিও আমার সঙ্গে এভাবে কথা বললে দেবল?

আমার আফশোস হয়। ওকে কখনও কড়া কথা বলি না। তবু এক এক সময় নিজেকে সামলাতে পারি না। ওর সামনে যে খাবার ধরে দেওয়া হয়, যে পোশাক ও পরে থাকে চোখ থাকলে হয়ত ও নিজেই লজ্জিত হত। চোখ না থাকায় ও বেঁচে গিয়েছে। কিন্তু আমাকে তো প্রতি মুহূর্ত এসব দেখতে হচ্ছে।

আমি ওর পাশে গিয়ে শয্যায় বসিয়ে বলি—রাগ করো না খিজির। তুমি তো জান, তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে অমন অবুঝ হয়ে ওঠো বলে নিজেকে স্থির রাখতে পারি না। আমি জানি কেউ তোমার কোনও উপকার করবে না, ক্ষতিই করবে।

—মুবারক সম্বন্ধেও একথা বলছ?

—হ্যাঁ, দেখে নিও।

—ও। কিন্তু শিহাবের কী হল?

আনোয়ারা গম্ভীর হয়ে বলে—তাঁকে অন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

খিজির স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। তার অন্ধ দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। আমি মুছিয়ে দি। খিজিরের মোহভঙ্গ হয়েছে। করুণ দেখায় ওকে।

কিছুদিন পরে আনোয়ারা আরও খবর সংগ্রহ করে আনল। সে বলল মুবারকও বন্দী হয়েছিল। তাকে অন্ধ করে দিতে কাফুর একজনকে পাঠিয়েছিল। তার সঙ্গী আরও দুজন ছিল। মুবারক তাদের বুঝিয়েছিল যে কাফুর কিছুদিনের মধ্যে এখনকার শিশু-সুলতানকে খুন করে নিজে সুলতান হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু একজন খোজা কখনো সুলতান হতে পারে না। কারণ তার বংশধর থাকে না। মুবারক তাদের প্রচুর অর্থ আর আমীর করে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়েছিল। কাজ হয়েছিল। ওরা সুলতানকে মুক্ত করে

দিয়ে দল গড়ে। সেই দলে মুনির ঢুকে পড়ে। অর্থের লোভে নয়, আমীর হওয়ার প্রলোভনেও নয়। শুধু তার প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য।

খিজির সব শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—গোয়ালিয়র না হলে আমিও পারতাম। কেল্লাদার তো আমার শত্রু ছিল না।

আমি বলি—ওসব ভেবে লাভ নেই।

—তুমি দেখে নিও দেবল, মুবারক আমার সঙ্গে অত খারাপ ব্যবহার করবে না। সে কাফুর নয়। সে আমার ভাই। আমার মায়ের সন্তান না হলেও বাবার তো বটে।

—শিহাবও তাই। তার ওপর সে সুলতান ছিল।

—ওসব ওমরাহদের কুপরামর্শ। তারা বুঝিয়েছে শিহাবউদ্দিন সুলতান থাকলে, তাকে আবার বন্দী হতে হবে। অন্ধ করা হবে। হয়ত মুবারক জানেই না যে শিহাবকে অন্ধ করা হচ্ছে। আমরা কিছুই জানি না।

আমি চুপ করে থাকি। ও ওর কল্পনা নিয়েই থাকুক। শুধু শুধু ওর শান্তি নষ্ট করে লাভ নেই।

—জানো আনোয়ারা ও কিছুই দেখতে পায় না বলে বেঁচে গিয়েছে। ও জানে না ও কত কৃশ হয়ে গিয়েছে, ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। কেল্লাদার এসে কথা বলার সময় অত্যন্ত উদ্ধতভঙ্গি প্রকাশ পায় তার মধ্যে। ওর ভাবভঙ্গি আরও অসহ্য। খিজির বুঝতে পারে না।

—আমার তো গা জ্বালা করে বেগমসাহেবা। সুলতান আলাউদ্দিনের প্রিয়তম পুত্রের এই দুর্গতি দেখে আমার কান্না পায়।

—এবারে যে কী হবে আমি জানি না।

কিছুদিন পবে খবর পাওয়া গেল ভূতপূর্ব সুলতান শিহাবুদ্দিন উমর খিলজীকে এখানে আনা হয়েছে। এরা কারো সঙ্গে কাউকে দেখা করতে দেয় না। শাদি কত দিন হল এসেছে, অথচ খিজিরকে তার সঙ্গে দুটো কথা বলতেও দেয়নি। শিহাবুদ্দিনের সঙ্গেও দেবে না। ও তো শিশু। অন্ধ অবস্থায় কী যে করবে। ওর মায়েরই বা কি দুর্গতি হয়েছে কে জানে। তিনকূলে তো আর কেউ নেই। দেবগিরির রাজবংশ ঝাড়ে-মূলে নির্মূল করেছে। কাকে বসিয়েছে জানা নেই।

এর কিছুদিন পরেই আনোয়ারা দেখল সে প্রহরীর সঙ্গে আলাপ জমাতে যাওয়ার আগেই সেই দরজা খুলে গেল। আর পাগলিনীর মতো ছুটতে ছুটতে এক বৃদ্ধা আমাদের কক্ষের দিকে আসছে। আমিও একটা আওয়াজ পেয়েছিলাম। কেল্লার এই অংশ সব সময়ই নীরব থাকে। শুধু চাপা আর্তনাদ আর হাহুতাশের শব্দ মাঝে মাঝে স্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে তরঙ্গ তোলে।

আমি দরজা খুলেই দেখি বৃদ্ধা উদ্ভ্রান্তের মতো আমার দিকে চেয়ে বলে ওঠে—সামসুল কোথায়। আমাকে একবার দেখতে দাও। আমি সুলতানের অনুমতি নিয়ে এসেছি। দেখছ না, কেল্লাদার আমাকে ছেড়ে দিয়েছে?

আমি বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠি—মাল্‌কা-ই-জাহান!

—কে? কে তুমি?

—আমি দেবল। দেবলরানী।

খিজিরের মা আমাকে অবলম্বন পেয়ে জড়িয়ে ধরে। সে আমার মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। আমার গা শির্‌শির্‌ করে অস্বস্তিতে।

—তুমি খুব রোগা হয়ে গিয়েছ। আমার সামসুল কেমন আছে? কত কষ্টে সুলতানের অনুমতি পেয়েছি। মসনদ রাখতে হলে সুলতানকে কত কঠোর হতে হয়, আমি তো জানি।

এককালের প্রতাপান্বিতা মাল্‌কা-ই-জাহানের এই পরিণতি আমি কল্পনা করিনি। আমার বারবার নিজের মায়ের কথা জানতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু এখন সেই প্রসঙ্গ তোলা যায় না। আমি তাঁকে নিয়ে খিজিরের সামনে এসে দাঁড়াই।

মাহরু বেগম স্তব্ধ হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়েই কেঁদে ওঠে—সামসুল, তোর এ কী দশা হয়েছে?

খিজির চিৎকার করে ওঠে—কে? কে?

—তোর মা।

মাহারু বেগম পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরে বিলাপ করতে থাকে। ওর বিলাপ শুনে বুঝি, পুত্রদের মধ্যে ওকে কত বেশি ভালবাসত।

—মা, আমাদের দুজনকে তুমি নিয়ে যাও। আমরা আর এখানে থাকতে পারছি না। ঘোড়ায় চড়তে না পেরে, শিকার করার সুযোগ না পেয়ে কেমন দুর্বল মনে হয় নিজেকে। তুমি তো সব পারো।

ওর কথা শুনে আমি ভাবি, মস্তিষ্কবিকৃতি হল কি না। এসব অবাস্তব কথা বলছে কেন?

মাহারু বেগম সখেদে বলে—সেই দিন তো নেই। কাফুর আমাকে ওখানে একটা ঘরে আটকে রেখেছিল। মোবারক কাফুরকে মেরে ফেলে খুব ভাল করেছে। সে আমাকে বলে—তুমি বড় কষ্ট পেয়েছ, সামসুলের কাছে যাও ভাল থাকবে। তারপর আমি যখন বললাম, ওকে দেখতে পাব তো? আমি জানি, এখানে সবাইকে আলাদা রাখা হয়। আমার কথা শুনে সে বলে ওখানকার যা নিয়ম তাই হবে। তখন আমি বারবার বলায় ও রাজি হয়ে গেল। ও খুব ভাল।

এবারে, আমি সন্তর্পণে বলি—আমার মায়ের কোনও খবর জানেন?

তোমার মা? সে তো অনেক আগের কথা। হারেমে চিৎকার-চেঁচামেচি করত বলে কাফুর নিজে এসে তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল। তুমি জানো না?

আমি শুধু অনুভব করি আনোয়ারা এসে আমার বাহু ধরে। এরপর কেল্লাদার নিজে এসে মাহারু বেগমকে বলতে গেলে ছিনিয়ে নিয়ে যায় খিজিরের কাছ থেকে। আমি তখনই জানতাম নিজের মাকে খিজির আর জীবনে দেখতে পাবে না। আমার মাকেও

আমি আর জীবনে দেখব না। খিজিরের মা তবু বেঁচে থাকবে হয়ত। কখনও তো কানে আসেনি যে কোনও স্ত্রীলোক বন্দী অবস্থায় তার সন্তান হত্যা করার আদেশ দিয়েছে।

আমাদের একমাত্র জানলা দিয়ে আকাশের তারা দেখা যায়। সুন্দর লাগে। আমি গুনে গুনে খিজিরকে বলি সে কথা। খিজির বলে, আবার গোনো তো। পরের বার কিন্তু তেইশ না হয়ে আটত্রিশ হল। খিজির হেসে উঠে বলে, তুমি গুনতেও পার না। আমি হলে ঠিক গুনে দিতাম। ও আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে, বোকা মেয়ে বুঝতে পারলে না? রাত যত বাড়ে আরও বেশি তারা ফুটে ওঠে অন্ধকার আকাশে। আমি কত দেখেছি, নতুন তারা উঠতে। তাই বলে সেইসব তারা নতুন নয়। দেরিতে দেখা যায় শুধু।

আমি ওর কথা শুনে একটু জোরে হাসি। ও নিশ্চিন্ত হয়। বলে—চাঁদ দেখা যায়?

—না। তবে বোঝা যায় পূর্ণিমার আগে আর পরে। বুঝতে পারি জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে বাইরের পাহাড় পর্বত, বন বনানী।

—মনে আছে, আমরা একবার দিল্লির বাইরে কোথায় যেন গিয়েছিলাম?

—হ্যাঁ। তুমি তো শিকার করতে গিয়েছিলে। সেখানে তাঁবু খাটিয়ে ছিলে আমাকে নিয়ে। পাশেব তাঁবুতে তোমার লোকজন। আমাদের দুজনকে বাইরে বের হতে দেখে ওরা উদ্বিগ্ন হয়ে বলে উঠেছিল—সুলতানজাদা, আর যাবেন না। শের আছে, ভালু আছে। তুমি হেসে বললে—আমাকে ওরা ভুলে গিয়েছে সেইজন্যেই এসেছি এখানে।

—সব মনে আছে। কী সুন্দর রাত্রি ছিল সেটা। আচ্ছা দেবল, এই জানলা দিয়ে সূর্য দেখতে পাও?

—না। তবে সূর্যের আলো একটু আসে। কিছুক্ষণ থাকেও।

—রাত্রে ওরা বাইরে যেতে দেবে, যেখানে হাঁটতে দেয়?

—বোধহয় না। কালই আনোয়ারাকে বলব জেনে নিতে। তাহলে অনেকখানি আকাশ দেখতে পারব। কত তারা দেখব, চাঁদও।

—সেই ভাল। দেবল, আমাদের একটা ছেলে থাকলে খুব ভাল হত। হাসত, কাঁদত, আধো আধো কথা বলত।

—না হয়ে বোধহয় ভাল হয়েছে। ওরা বাঁচতে দিত না। বিধাতা আমাদের বোধহয় সেই শোক আর দিতে চান না।

—তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু শিশুকে কেউ মারতে পারে?

—পারে। ওর যে মসনদে বসার অধিকার থাকবে।

খিজির নীরব হয়ে যায়। তার তারা দেখার উৎসাহ কোথায় মিলিয়ে যায়।

আমি ওর হাত ধরি। বলি—ঘুমোবে না?

—আমি মাঝে মাঝে ভাবি, এসব বোধহয় মিথ্যা। সুলতান আলাউদ্দিন এখনও বেঁচে

বয়েছেন। তাঁব ছেলেবা আবাব আগেব মতো ঘোবাঘুবি কবছে। মা দাপটেব সঙ্গে বেগম মহলে ঘুবে বেড়াচ্ছে। এটা সত্যি হয না দেবল?

—তেমন হলে তো আমিও আসিনি তোমাব জীবনে।

—না না তুমি এসেছ। তুমি ছাড়া আমি ভাবতে পাবি না। ওসব কল্পনা কবছিলাম দেবল। কিছু মনে কবো না।

পবদিন কেল্লাদাব স্বযং এসে দেখা দিল। সাধাবণত ওকে আব দেখাই যায না। সৌজন্যবোধেবও কোনও বালাই নেই। মসনদে নিজেব ছোট ভাই বসেছে ভেবে উন্নত ভবিষ্যতেব কল্পনায মাঝে মাঝে মশগুল থাকে খিজিব। অথচ কেল্লাদাবেব ব্যবহাব দিনেব পব দিন অসম্মানজনক হয়ে উঠছে।

কেল্লাদাব হাতেব একটা জড়ানো কাগজ তুলে ধবে বলে—চিঠি।

আনোযাবা এগিযে গিযে বলে—কাব?

—সুলতানেব।

—আমাকে দাও।

—তুমি? তুমি তো বাঁদী। সুলতানেব চিঠি তোমাকে দেব?

আনোযাবা আব একটিও কথা বলে না।

কেল্লাদাব এগিযে এসে ব্যঙ্গেব সঙ্গে খিজিবকে সেলাম জানিযে বলে —আপনি তো আব সুলতানজাদা নন। সুলতানেব ভাই। তিনি এই চিঠি দিযেছেন আপনাকে। আব একটি কাগজ বেখে গেলাম উত্তব লিখে দেবেন। আমি দুদিন পবে এসে নিযে যাব।

খিজিব কেল্লাদাবেব সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। কিন্তু ভেতবে ভেতবে সে যে উত্তেজিত হযে উঠছিল আমি বুঝতে পাবছিলাম। সে চলে যেতেই খিজিব বলে ওঠে—দেখো, মুবাবক নিশ্চয ভাল কিছু লিখেছে।

আমি পত্রটি সামনে মেলে ধবি। খুব ছোট নয। আমি পড়তে থাকি ঃ আমি শৈশব থেকে জানতাম সুলতান আলাউদ্দিনেব পবে তুমিই হবে দিল্লিব সুলতান। তোমাকে অন্য চোখে দেখতাম।

খিজিব বলে ওঠে—দেখলে দেবল, দেখলে? বলেছিলাম না?

—দাঁড়াও। অত উত্তেজিত হযো না। সবটা পড়ি আগে।

—হ্যাঁ পড়ো।

—তোমাকে সমীহ কবতাম। কিন্তু কোথা থেকে এক ক্রীতদাস খোজা এসে সব তছনছ কবে দিযে গেল। আমিও তো মবতে মবতে বেঁচেছি। বুদ্ধি থাকলে কী না হয। কাফুবকে বেশিদিন বাঁচতে দিইনি। আব ওকে যাবা মেবেছে তাবা প্রথমে অনেক সুবিধা আদায কবেছে। তিনজনকে মেবেও ফেলেছি। কিন্তু একজন হাওযায মিলিযে গিযেছে। লোকটা বুদ্ধিমান। আমাব মতলব সে ধবতে পেবেছিল। কিন্তু যাবে কোথায?

যাহোক, আমি যদি আগে সুলতান হতে পাবতাম তাহলে তুমি আব শাদি অন্ধ হতে

না। শিহাবুদ্দিন বাচ্চা হলে কী হবে, ওর লোকজন আমাকে মেরে ফেলার চক্রান্ত করেছিল। তাই ওর চোখ দুটো গেলে দিতে বাধ্য হয়েছি।

আসল কথায় আসি। নিয়ম হল কোনও অন্ধ সুলতান হতে পারে না। না হোক। কিন্তু সুলতান না হয়ে কোনও জায়গার শাসনকর্তা তো হতে পারে। তাতে বাধা কোথায়? আমি ঠিক করেছি, তোমাকে গুজরাটের শাসক করে পাঠাব।

খিজির চেঁচিয়ে ওঠে—দেখলে দেবল, বলেছিলাম না? এতদিনে এই কয়েদখানা থেকে মুক্তি পাব। গুজরাট শাসন করব। তোমাকে সুখের মুখ দেখাব। আমি কয়েকজন আমীরকে চিনি। তাদের নিয়ে যাব। তারা খুব বিশ্বস্ত। তখন আমাদের সন্তান হবে।

আমি বলি—আরও একটু বাকি রয়েছে। শেষ করি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ শেষ কর।

আমি পড়িঃ কিন্তু তার পরিবর্তে একটি মাত্র শর্ত তোমাকে পালন করতে হবে। দেবলরানী ক্রীতদাসী ছাড়া কিছু নয়। তাকে জোর করে তুলে আনা হয়েছে। তোমার বেগম হল আল্‌প্‌ খাঁয়ের কন্যা। দেবলরানীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। তুমি ওর রূপে মোহাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছ মাত্র।

খিজির চিৎকার করে ওঠে—না।

এই প্রথম আমার বুক কেঁপে ওঠে। মুবারক যদি জোর করে আমাকে নিয়ে যেতে চায়, কী করব? আত্মহত্যা, হ্যাঁ দ্বিতীয় কোনও পথ নেই।

আনোয়ারা প্রথম থেকে শুনছিল। দেখলাম, ছুটে ঘর থেকে বাইরে চলে গেল। খিজিরের মুখ কাগজের মতো সাদা। সে কাঁপতে থাকে। আমি তাকে ধরি।

খিজির গম্ভীর অথচ ভগ্নকণ্ঠে বলে—আমি এখানেই থাকব দেবল। তুমিও থাকবে।

আমি আর বলতে পারলাম না যে জোর করেও ওরা আমাকে তুলে নিয়ে যেতে পারে।

সেই সময় আনোয়ারা ফিরে আসে। সে আমার কাছে এসে দাঁড়ায়। আমি ইঙ্গিতে প্রশ্ন করি কোথায় গিয়েছিল হঠাৎ। সে তার করতলের ওপর ছোট দুটো কৌটো দেখায়।

আমি খিজিরের কাছ থেকে উঠতে গেলেই সে বলে ওঠে—না।

—আমি যাচ্ছি না খিজির, এখানেই আছি।

আনোয়ারা কৌটো দুটো খোলে। দুটো বড় বড় কালো বড়ি রয়েছে। ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে—বিষ বড়ি। মুনিরকে অনুরোধ করতে সে এনে দিয়েছিল। আর ভয় নেই বেগমসাহেবা।

আমি আনোয়ারার হাত চেপে ধরি। সে একটু সরে গিয়ে আমাকে কুর্নিশ করে বলে—আমার জীবন আপনার জন্যে সমর্পণ করেই রেখেছি, বেগমসাহেবা।

আমার দৃষ্টি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়।

সুলতান কুতবউদ্দিন মুবারক শাহের কাছে খিজিরের সংক্ষিপ্ত জবাব গেলঃ আমি

গুজরাটের শাসনকর্তা হতে চাই না। আমি এখানেই থাকব। দেবলবানীকে আমি ছাড়তে পারব না।

এরপর দীর্ঘ প্রতীক্ষা। প্রতীক্ষা খিজিরের তো নয়—আমার। একটার পর একটা দিন যায়, আমার বুকের কাঁপুনি কমে না, বরং বেড়ে যায়। কারণ দ্বাবরক্ষীদের কাছ থেকে আনোয়ারা দিল্লির অনেক খবর সংগ্রহ করে আনে। তাতে বোঝা যায় এই অল্প বয়সে সে অত্যন্ত নৃশংস হয়ে উঠেছে। শুধু সন্দেহের বশে অনেককে হত্যা করে রক্তলোলুপ হয়ে উঠেছে। এখানে তার তিন সহোদর অন্ধ অবস্থায় বন্দী হয়ে রয়েছে। তারা কি নিস্তার পাবে?

কিছুদিন পরে খিজির একদিন আমার গায়ে হাত বুলিয়ে বলে ওঠে—তুমি রোগা হয়ে গিয়েছ, দেবল।

—কে বলল?

—আমি বুঝতে পারি। দৃষ্টি হারিয়ে আমি জ্ঞানী হয়েছি। বুঝতে পারি তোমার মন খুব খারাপ। এখানে তো অনেকদিন রয়েছি, এমন কখনও হয়নি।

—হতে পারে। সব সময় তো শরীর একরকম যায় না। তুমিও আর তারা গুনতে বল না। এমনকী সামনের চত্বরেও ঘুরতে চাও না।

—আমার ভাল লাগে না। মোবারক তোমাকে বলে ক্রীতদাসী। আস্পর্ধা দেখেছ? সুলতান হয়ে নিজেকে কী ভাবে সে?

—ওসব নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না।

—না ঘামিয়ে পারি না। ভাইদের সঙ্গে তো সেভাবে মিশতে পারিনি। মা আমাকে সব সময় একটু আলাদা করে রাখার চেষ্টা করত।

—পুরনো কথা ভুলে যাও। তোমার মা-ও এখানে রয়েছেন।

—হ্যাঁ, ফলভোগ করছে।

আমি আর কিছু বলি না। বুঝতে পারি, অতীতের অনেক কিছু চিন্তা করে ওর মনে মাঝে মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তার একটু বহিঃপ্রকাশ তো ঘটবেই। আত্মসমালোচনাও ও কম করে না। বলে, আমি অপদার্থ। সুলতানীর মর্ম আর গুরুত্ব আমি বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারার সেই বুদ্ধির গভীরতা আমার ছিল না। ভেবেছিলাম সুলতানী আমার হাতে খেলনার মতো চলে আসবে।

—আঃ খিজির। তুমি বড় বেশি আজেবাজে চিন্তা করো।

খিজির আমাকে আঁকড়ে ধরে বলে—কী করব দেবল। আমার এই আফসোস শুধু তোমার জন্যে। কিছুই পেলে না আমার কাছ থেকে।

—পেয়েছি। যথেষ্ট পেয়েছি। কয়জন পায়? তোমার মা পেয়েছেন? অন্যান্য বেগমরা পেয়েছেন? মুবারকের বেগমরা পাবে? কখনও নয়। সেই মনই নেই তার।

সেই সময় আনোয়ারা ছুটতে ছুটতে এসে চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে কাঁপতে থাকে থরথর করে। আমার হৃদপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে যায়। দেখি আনোয়ারা নিজেকে

স্থির রাখতে না পেরে মাটিতে বসে পড়ে। আমি বুঝতে পারি ঘোর অমঙ্গল একটা কিছু ঘটবে কিংবা ঘটেছে। ওকে এরকম ভয় পেতে কখনও দেখিনি। আঘাত পেয়ে আমি যত না শক্ত হয়েছি ও তার চেয়ে অনেক বেশি শক্ত।

আমি গিয়ে তার পাশে বসে বলি—কী হয়েছে আনোয়ারা?

সে হাত তুলে ইসারায় আমাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে হাঁপাতে থাকে। তারপর কিছুটা স্থির হয়ে বলে—প্রহরী বলল, সুলতান একজনকে পাঠিয়েছেন এখানে। নাম তার শাদি খাট্টা। খুন করাই তার কাজ। সে দিল্লীতে থাকে না। কোথায় যেন থাকে, ভুলে গিয়েছি। সুলতানের নির্দেশ গিয়েছিল তার কাছে। তাই এসেছে।

—কেন?

আনোয়ারা কেঁদে উঠে বলে—কেন আবার, খুন করতে। ভাইদের খুন করাতে পাঠিয়েছেন সুলতান।

আনোয়ারা পরে আমাকে বলেছিল, একথা শুনেই আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম।

জ্ঞান ফিরে পাই খিজিরের ডাকে। বারবার সে বলছে—দেবল তুমি কোথায়? দেবল, কথা বলছ না কেন? দেবল, তুমি কি অসুস্থ হয়ে পড়েছ?

আমার আচ্ছন্নভাবে না কাটলেও কোনওরকমে উঠে শয্যায় উপবিষ্ট খিজিরের বুকে মাথা রেখে বলি—এই তো আমি।

—তুমি কাঁদছ দেবল? কেন?

—আমাদের কান্নার কি মাথামুণ্ড আছে? কাঁদার জন্যেই তো জন্ম নিয়েছি। তোমার এই বন্দী অবস্থা আর সহ্য করতে পারি না।

সেই সময় প্রচণ্ড গর্জন শুনলাম। পাশের দেওয়াল ভেদ করে আমাদের কানে ধাক্কা দিল। আমি খিজিরকে ছেড়ে দৌড়ে খোলা দরজার কাছে এলাম। তার আগেই আনোয়ারা আরও এগিয়ে গিয়েছে।

—আমাকে মারতে এসেছিল হারামির দল? এই দ্যাখ্ তবে।

একটা পতনের শব্দ।

একটু পরে অপর কণ্ঠে শীতল জবাব—ঠিক আছে। এবারে তাহলে তুই দ্যাখ্।

আনোয়ারা কিছুক্ষণ কান খাড়া করে থেকে বলে ওঠে—শাদি খাঁ শেষ হলেন।

আমি একথা শুনেই ছুটতে থাকি খিজিরের কাছে। গিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরে রাখি।

—কী হল দেবল? তুমি এমন করছ কেন? কখনও তো এমন করো না।

আমি আরও জোরে তাকে চেপে ধরে রাখি।

—দেবল? কী হয়েছে তোমার?

—তুমি শাসনকর্তা হও। আমাকে দিল্লিতে পাঠিয়ে দাও।

—একথা বলছ কেন?

—তোমার প্রাণ বাঁচবে। নইলে ওরা তোমাকে খতম করবে।

—তোমার বিনিময়ে প্রাণ বাঁচব? তাই কখনও হয়?

—এখনও হয়ত হয়। তুমি রাজি হয়ে যাও।

এবারে খিজির খুব স্বাভাবিক এবং দৃঢ়ভাবে বলে—না।

দরজার কাছ থেকে আনোয়ারা চিৎকার করে ওঠে—বেগমসাহেবা, ওরা আসছে।

আনোয়ারার অস্বাভাবিক চিৎকার শুনেই খিজির মুহূর্তে সব বুঝে ফেলে।

বলে—ও, ওরা আসছে আমার কাছে। দুনিয়ার এক কোণে তোমার পাশেও থাকতে দেবে না মুবারক। দেবল, আমি তোমাকে ছাড়া কিছু চাইনি।

—জানি। আমার চেয়ে সেকথা বেশি কেউ জানে না। আমি বিশ্বাস করি তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে। এ জন্মে না হোক অন্য জন্মে অন্য কোথাও। আমি যে বিধর্মী। আমি জন্মান্তর মানি। সতীমা মিথ্যা বলে না।

সেই সময় দ্বার খুলে যায়। প্রথমে প্রবেশ করে কেল্লাদার। তার মুখে হাসি। আমি খিজিরকে বলি—খিজির কেল্লাদার হাসছে।

—না হাসলে ওরা যে মরবে। কেউ মুবারককে ধরে এখানে পাঠালেও তার এই দুর্দিন হলে ও হাসবে।

কেল্লাদার চিৎকার করে ওঠে—চুপ্।

পাশের একজন দীর্ঘদেহী ব্যক্তির মুখ বিষাদাক্রান্ত। কেল্লাদার তাকে দেখিয়ে বলে—ইনি হলেন এখানকার কাজী, মৈনুদ্দিন মুবারক। আর ইনি--

তৃতীয় ব্যক্তি তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে—আমি হলাম শাদি খাট্টা। আমাকে সুলতান এখানে পাঠিয়েছেন কাজ হাসিল করার জন্য। আপনার ভাই শাদি খাঁকে শেষ করে এলাম। তিনি রেগে গিয়ে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন। এতদিন এখানে থেকেও এই শক্তি পেলেন কী করে? আমি এই কেল্লাদারকে ধমকে দিয়েছি। আপনার ভাই যদি অন্ধ না হতেন, তাহলে আমাকে শেষ করে দিতেন।

খিজির বলে ওঠে—আমি ওসব করব না। আমাকে তুমি বাঁচতে দাও। আমাকে দেবলের কাছ থেকে কেড়ে নিও না।

শাদি খাট্টা হেসে ওঠে। তাই দেখে কেল্লাদার আরও জোরে হাসে। শুধু কাজী গম্ভীর।

শাদি খাট্টা বলে—আপনার ভাইদের দুই বেগমকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওঁরা খুব কান্নাকাটি করছিলেন। এঁকেও সরিয়ে দিতে হবে।

আমি আনোয়ারার দিকে তাকিয়ে কোনওরকমে বলি—আমি কাঁদব না।

ওরা বিস্মিত হয়। ওরা জানে না আমার ভেতরে কী হচ্ছিল। আমি ভাবছিলাম, শেষ পর্যন্ত একটা কিছু বিস্ময়কর ঘটে যাবে। খিজির বেঁচে যাবে। খিজির যে মরতে পারে না। আমার চোখের সামনে সেই মুহূর্তে কেমন যেন অন্ধকার নেমে আসে। খিজিরের চিৎকার শুনি। সে কেঁদে বারবার প্রাণভিক্ষা চাইছে। তারপর একটা শব্দ। চারদিক স্তব্ধ।

আনোয়ারা আর্তনাদের সুরে কেঁদে ওঠে। তারপরে আর মনে নেই।

আনোয়ারা আমার চেতনা ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলে—ওরা আপনাকে কালই দিল্লি নিয়ে যাবে। ওই ঘাতককেই দিল্লি নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন সুলতান।

—ঘাতক? ও। খিজির সত্যিই আর নেই? বল আনোয়ারা, খিজির নেই?

আনোয়ারা কোনওরকমে ঘাড় নাড়িয়ে উত্তর দেয়।

—তুমি দেখেছ?

আনোয়ারা ঘাড় হেলায়।

—কীভাবে?

—অসি।

—লোকটার হাতে তো অসি ছিল না। তাই আমি ভেবেছিলাম অন্য কিছু ঘটে যাবে।

—কেল্লাদারের অসি।

—তারপর? তারপর আনোয়ারা?

—আমি বলতে পারব না। শেষ মুহূর্তে তিনি স্থির হয়ে দুই চোখ নিমীলিত করে ছিলেন।

—আমি বাঁচতে চাই আনোয়ারা। আমি দেখতে চাই মুবারকেরও অমন একটা কিছু হোক। আমার মা-ও এইরকম কোনও প্রতিহিংসা পূরণের জন্য রাজপুত রমণী হয়েও স্বেচ্ছায় বেগমমহলে চলে এসেছিল। আমি বেগমমহলে যাব না। তেমন সম্ভাবনা দেখলে তোমার ওই কৌটো তো আছেই। আমি শেষ দেখতে চাই।

—আমিও।

—কিন্তু যদি শেষ পর্যন্ত ওরা দিল্লিতে গিয়ে পৌঁছোয়?

—পালাতে হবে তার আগে।

—যদি না পারি?

—তাহলে আত্মহত্যা। চেষ্টা করতে ক্ষতি কী?

খিজির যে নেই, এখনও তা অনুভব করতে পারছি না। তবে এটা বুঝতে পারছি আমার কোনও পিছুটান নেই। আমার কোনও উৎসাহ নেই, উদ্বেগও নেই। আমি নিরাসক্ত। তবু এই ঘরখানাই আমার কাছে সর্বস্ব। এখানে সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারলে বড় ভাল হত। কিন্তু ওরা দেবে না।

পরদিন আমাদের দুজনকে দুটো সাধারণ বোরখা এনে দেওয়া হল। আমার বোরখা তো ছিল বহুমূল্যবান। আনোয়ারার বোরখাও বেশ ভাল। আনোয়ারা ফিস্‌ফিস করে মন্তব্য করেছিল, কেল্লাদার দিল। আমার ওসবে কোনও উৎসাহ ছিল না। শুধু শকটে উঠেই কান্নায় ভেঙে পড়লাম। খিজিরকে চিরদিনের জন্য রেখে যাচ্ছি এখানে। আনোয়ারা আমাকে চেপে ধরে চুপ করে থাকে। সে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে না। এবারে সে আর আমি একই শকটে। আমি যে তার চেয়েও নিম্নশ্রেণীর। আমি ক্রীতদাসী। ভালই হল।

খিজির আর তার দুই ভাইকে কেল্লার বিজয়মন্দির বলে একটা জায়গায় গোর দেওয়া

হয়েছে। সেই খিজির, যার নিষ্পাপ দৃষ্টি আমাকে ভালবাসতে শিখিয়েছিল। নিষ্পাপ বলেই সে এই ক্লেদাক্ত পৃথিবীর নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতায় হেরে গেল। খিজির, তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না জীবনে। কিন্তু আমি পরজন্মে বিশ্বাস করি। খিজির, কেউ যদি তোমার সঙ্গে ওই ঘরখানায় সারাজীবন বন্দী করে রাখত, আমি অনায়াসে থাকতে পারতাম। তোমাকে আকাশের তারা গুনে বলতাম। জ্যোৎস্না উঠেছে কি না বলতাম। কখন ভোরের সূর্যের প্রথম রঙিন রশ্মি গবাক্ষে উঁকি দিত, আমি বলতাম। তাও ওরা তোমাকে ছিনিয়ে নিল।

—বেগমসাহেবা।

আনোয়ারা আমাকে মৃদু ঠেলছিল।

—কী হয়েছে আনোয়ারা!

ওরা বলছে আমরা সঙ্গে করে কিছু নিয়ে যাচ্ছি কি না। আপনি শোনেননি।

—না।

—আমি বললাম, তোমরা দেখলে তো। তা ছাড়া সঙ্গে কিছু নিয়ে গেলেই বা কী? আমাদের তো সুলতানের কাছে নিয়ে চলেছ। ওরা আর কিছু বলে না। আপনি শুনতে পাননি?

—না।

—আমাদের সর্বাঙ্গে যে স্বর্ণমুদ্রা সেলাই করা রয়েছে ওরা বুঝতে পারবে কি না জানি না। বোধহয় পারবে না। তাহলে দিল্লি থেকে গোয়ালিয়র আসার পথেও বুঝতে পারত। তখন তবু এটাওটা দেখেছিল। শুধু গায়ে হাত দিতে সাহস পায়নি। সেই পোশাক এতদিনে আমরা আবার পরছি। কেল্লাদার শুধু একবার কেমনভাবে যেন দেখেছিল।

—তোমার তুলনা হয় না আনোয়ারা। সব কিছু হয়েছে তোমার বুদ্ধিতে। আমি অতশত বুঝি না। এখন আমার একমাত্র চিন্তা কী করে ওদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব।

—যেখানে প্রথম সুযোগ পাব সেখানেই। তার আগে দেখতে হবে এরা কতটা সতর্ক। এরা কি ভেবেছে যে আমরা পালাতেও পারি? আমিও ভাবছি, আপনি পারবেন কি?

—আমার কথা তুমি ভেবো না। আমি যুদ্ধ করতে জানি। আমার হাতে একটা অসি দিয়ে ওই সামনের গাড়িতে বসে রয়েছে যে শাদি খাট্টা, সে যদি অসিযুদ্ধে নামত তাহলে বলা যায় না তার ফল কী হত। আমি বাঁচতে চাই আনোয়ারা। সুলতান কুতুবউদ্দিন মুবারকের ধ্বংস না দেখা পর্যন্ত আমি বাঁচতে চাই। আমার চোখ দিয়ে যে খিজির দেখতে পাবে দুশমনের পরিণতি।

দিনের পর দিন আমরা এগিয়ে চলেছি দিল্লির পথে। ওরা আমাদের জন্য বিশেষভাবে সতর্ক না হলেও এমনিতেই হই-হুল্লোড় করে অনেক রাত অবধি কাটায়। তাছাড়া অধিকাংশ দিনই একটু রাত হতে না হতেই গাড়ি থামায়। তাই সুযোগ খুব কম। আমাদের জন্য বিশেষ কোনও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নেই। কোনওরকমে একটা তাঁবু খাটিয়ে দেয় স্ত্রীলোক বলে।

তারা আমাকে রূপসী বলে জানে না। দেখেনি আমাকে। শাদি খাট্টাও কোন খোঁজ খবর রাখে না। যখন আমাকে দেখেছিল তখনও বোরখায় আবৃত ছিলাম।

একদিন সন্ধ্যার একটু আগে আমরা একটি বনাঞ্চলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। দুদিকে ঘন সারিবদ্ধ গাছ। বুঝতে পারি না অরণ্য কতটা নিবিড়। আনোয়ারাকে বলি—আমি এই সুযোগ নিতে চাই। তুমি প্রস্তুত হও।

—হিংস্র জন্তু থাকতে পারে।

—না আনোয়ারা। তাহলে এদিক দিয়ে আসত না। ওদের কেউ না কেউ সেকথা জানে।

—ভালুক তো থাকতে পারে।

—থাকুক। ঝুঁকি নেব।

—গ্রামগঞ্জ কত দূরে রয়েছে জানা নেই।

—তুমিও শেষ পর্যন্ত এমন করছ? আমি এখনি পালাব।

আনোয়ারা বলে ওঠে—চলুন বেগমসাহেবা।

—আমি আর বেগমসাহেবা নই। তুমিও আনোয়ারা নও। সেই নাম পরে ঠিক করে নেব। এই জায়গায় অন্ধকার বেশ গাঢ়। সামনের পর্দা ঝুলতে থাকুক।

—পেছনের গাড়ি?

—এখনো বাঁক অতিক্রম করেনি। এসো।

আমরা দুজনা নেমেই পাশের গাছের আড়ালে চলে যাই। সেখানে একটু অপেক্ষা করি। পেছনের গাড়িটা এগিয়ে আসে। তাতে কয়েকজন স্ত্রীলোককে দেখতে পাই। অবাক হই। ওদের আগে কখনও দেখিনি। বোধহয় জল্লাদের বেগম ওরা। দূরে তাই আরও একটা তাঁবু দেখতাম। সেই গাড়ি চলে যাওয়ার পরে কিছু সশস্ত্র সিপাই ঠাট্টা তামাশা করতে করতে চলে গেল। ওরা দলটিকে পাহারা দিতে দিতে চলেছে।

আমরা বনের ভেতর দিয়ে যতটা পারি দূরে চলে যেতে থাকি। কষ্ট হয় খুব। এমন ঘন বন আমি আগে দেখলেও পায়ে হেঁটে অতিক্রম করিনি। কখনও কখনও দুহাত দিয়ে ডালপালা সরাতে হচ্ছে। আনোয়ারার আরও অসুবিধা। সে বয়ে নিয়ে চলেছে একটা ভারী বোঝা। আমার আর ওর আরও দু-এক প্রস্থ পোশাক।

রাত গভীর হয়। শেয়ালের ডাক ছাড়া অন্য কোনও পশুর অস্তিত্ব বোঝা গেল না। হ্যাঁ, কিছু সজারু কাঁটা ঝমঝমিয়ে পথ ছেড়ে পালিয়েছে। পথ বলতে আমাদের তৈরি করা পথ, যার অস্তিত্ব আমরা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

আমরা অতিরিক্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ি। একটা ফাঁকা জায়গা দেখতে পেয়েই আনোয়ারা কাঁধের বোঝা মাটিতে নামিয়ে বসে পড়ে। তারপরই সে অকাতরে ঘুমিয়ে পড়ে। আমার চোখে ঘুম নেই। কবে ঘুম আসবে আমি জানি না। মুবারক শেষ হওয়ার আগে আমি শেষ ঘুমও চাই না। তাই একটু পরে আনোয়ারাকে জাগিয়ে চলতে থাকি।

হঠাৎ একসময় বন শেষ হয়ে যায়। মানুষের কুটির। কুটিরগুলো ঘুমোচ্ছে। শুধু তার

কুকুরগুলো অচেনা মানুষের অস্তিত্ব বুঝতে পেরে ডাকতে থাকে। আর তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে দূরের কুকুরগুলোও ডাক শুরু করে দেয়।

আমি বলি—ধরা পড়ে যাব নাকি?

—না। ওরা অমন ডাকে। কারও তাতে ঘুম ভাঙে না। মোষকে দেখলেও ডাকে।

একটু পরে আনোয়ারা চিৎকার করে ওঠে—বেগমসাহেবা মসজিদ।

আমি লক্ষ করি, মসজিদের পাশে একটা কুয়ো রয়েছে? দেখেই আমার তৃষ্ণা প্রবল হয়ে ওঠে। বুঝতে পারি গলা একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে। কিন্তু জল তোলার পাত্র দেখা গেল না। একটা ছোট্ট বাগান। চারদিক নিস্তব্ধ। তবে বোঝা গেল ভোর হতে বেশি দেরি নেই।

আনোয়ারা বলে—এবারে কী করবেন বেগমসাহেবা?

—এখন থেকে আমি হাসিনা আর তুমি নাদিরা। মনে থাকবে?

—হ্যাঁ হাসিনা। কিন্তু কী করব এবারে?

—এখানেই একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তবে এখানকার মোল্লা যদি সুবিধার না হয় তাহলে আমাদের বিপদ হতে পারে। সেই ঝুঁকি নিতেই হবে। কিন্তু মরে গেলেও আসল পরিচয় দেওয়া চলবে না।

—আপনার এই পরিচয় আমার কাছে নতুন বেগমসাহেবা।

—ওঃ, বললুম তো নাদিরা ওসব ভুলে যাও।

—আর হবে না হাসিনা। তবে তোমাকে নতুন করে চিনলাম।

—আমি যে সাবালিকা হয়েছি। যখন বাবার কাছে ছিলাম, তখনও এমন ছিলাম।

মোল্লাসাহেবের খড়মের আওয়াজ পেলাম। তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। সে বাইরে এল। আর পাঁচজন মোল্লার মতোই দেখতে। বেশি ফর্সা বলে মনে হল না। তবে কালো নয়। রোগা অথচ ঋজু দেহ। ভালই বয়স হয়েছে। সে মসজিদের পেছনে কোথায় চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে রজ্জুসমেত একটা পাত্র নিয়ে এল।

—চলো নাদিরা। আমরা এগিয়ে যাই। আমার ভীষণ পিপাসা পেয়েছে। আমরা একই মানুষের বিবি। সে আমাদের খুন করবে খবর পেয়েছি। সে একজন সুন্দরীকে সাদি করবে।

—ঠিক আছে হাসিনা। খোদা আমাদের সহায় হোন।

আমরা গুটি গুটি এগিয়ে যাই কুয়োর কাছে।

মৌলবী প্রায় চমকে ওঠে—কে? কে তোমরা? এত ভোরে? কোথা থেকে এলে? কী মুশকিল।

এবারে কথা বলার ভার নেয় নাদিরা। সে বলে—আমাদের গলা শুকিয়ে গিয়েছে। আগে একটু পানি।

মোল্লা নিজে কুয়ো থেকে জল তুলে আমাদের দুজনার আঁজলায় ঢেলে দেয় একটু একটু করে। আমাদের পিপাসার নিবৃত্তি হয়।

নাদিরা বলে—ইমামসাহেব।

মোল্লা ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে, কী মুশকিল। ইমাম বলতে নেই। আমি অত উঁচু দরের কেউ নই। আমি মৌলবী ছিলাম, হয়েছি মোল্লা।

নাদিরা বলে—মোল্লাসাহেব আমরা এসেছি অনেক দূর থেকে। চার-পাঁচ দিনের পথ, তার চেয়েও বেশি হতে পারে। আমাদের তো লেগেছে আট-দশদিন।

—জায়গাটার নাম কী?

নাদিরা একটা নাম বলে। নিশ্চয় তার নিজের গ্রামের নাম। বেশ সপ্রতিভভাবে বলল নামটা।

মোল্লাসাহেব বলে—আমি শুনিনি।

—আমরা দুজনা আমাদের স্বামীর দুই বিবি। আপনাকে মিথ্যে বলব না, আমাদের দুজনার মধ্যে ঝগড়া হত ঠিকই, কিন্তু স্বামীর অনুগত ছিলাম। সেই স্বামী আমাদের লুকিয়ে আর এক সুন্দরীকে সাদি করবে বলল। আমরা প্রতিবাদ করায়, স্বামী বিশ্রীভাবে হাসল। পাড়ার সবাই শুনে চুপি চুপি বলে যায় এবারে তোদের দুজনাকে খুন করবে। আগেও প্রথম বিবিকে খুন করেছিল। আমরা ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। তারপর হাসিনা বলল, চল পালাই। আমি বললাম, ঠিক আছে। স্বামীর অবস্থা ভাল। পাঁচ-ছয়টা মোহর লুকোনো ছিল তার, আমি জানতাম। নিয়ে পালিয়েছি।

—কী করবে এখন?

—আপনি যা বলবেন।

—কী মুশকিল? আমি তো সংসারের দায় থেকে মুক্তি পেতে এখানে এসে রয়েছি।

—আপনি তো মোল্লা। ধর্মে বলে নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে হয়।

—কী মুশকিল। যাও, তোমরা ওই ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করো। একটু পরে নমাজ পড়তে আসবে সব। পরে ভেবে দেখব।

মানুষটা এত ভাল যে আমাদের বিশ্বাস হচ্ছিল না। ঘরের মধ্যে গিয়ে আমি বলি—বিধাতা বোধহয় আমাদের বাঁচিয়ে দিলেন। আমার কৌটোটা দাও তো। একজনের কাছে রাখা ঠিক হবে না। যদি একা কেউ ধরা পড়ে যাই।

ঠিক সময়ে আমাদের খাবার এল। একা মানুষ কী করে ব্যবস্থা করল বলতে পারব না।

—তোমরা কি অল্পবয়সী?

—একেবারে অল্পবয়সী নই।

—ওর রঙটা বড় ফর্সা। মুশকিল।

আমি বলি—কেন মোল্লাসাহেব?

—বুঝছ না? ফর্সা রঙ বড় বেশি নজরে পড়ে। কী মুশকিল।

নাদিরা বলে ফেলে—আপনি আমাদের মুশকিল আসান করে দিন।

—তাই তো ভাবছি। কী করব। এখানে তোমরা থাকলে ধরা পড়ে যাবে। তোমাদের

শহরে যেতে হবে। কাছের শহরে আমার একটা বাড়ি আছে। কেউ থাকে না। আমার একটা ছেলে ছিল, পাঁচ বছর আগে মারা গিয়েছে। বেগম গিয়েছে আরও আগে। তোমাদের ওখানে রেখে আসব। সবাইকে বলে আসব, তোমরা বাড়িটা দেখাশোনা করবে। তোমরা আমার পরিচিত। তাহলে মিথ্যা বলা হবে?

নাদিরা বলে ওঠে—না না। একটুও মিথ্যা বলা হবে না।

—কাল রাতে তোমাদের নিয়ে যাব। একজনকে ভার দিয়ে যাব দুদিনের জন্য।

ছোট্ট গ্রাম। লোকজন বেশি নেই। সন্ধ্যার পরে মসজিদের দিকে বিশেষ কেউ আসে না। পরদিন আমরা রওনা দিলাম মোল্লা সাহেবকে নির্ভর করে। জানি না ঠিক করলাম কি না। তবে আমার অনুমান যদি ঠিক হয় তা হলে মানুষটা ভাল। নাদিরারও সেই মত।

একটু এগিয়ে গিয়ে একটা মাঠের মধ্যে পৌঁছোই। মোল্লা সাহেব বলে—আমার নামটা তোমরা মুখস্থ করে নাও তো। বলো আবদুল বারি।

একটু পরে বলে—কী হল বললে না তো?

—বলছি তো।

—কী মুশকিল। শুনতে পেলাম না তো?

নাদিরা বলে—জোরে বলিনি।

—জোরে বলো। আমি শুনব। বলো।

নাদিরা বলে—আবদুল বারি।

—ঠিক আছে। এবারে তুমি বলো?

আমি বলি—আবদুল বারি।

—কী মুশকিল।

—কেন? আমি তো ঠিক বললাম।

—সেকথা নয়। তোমার গলা বড় মিঠে। এদিকে রঙও ফর্সা। তুমি বেশি কথা বলো না কারও সঙ্গে। বললেও বিকৃত গলায় বলবে। তুমি তো আর বোঝা হয়ে থাকতে পারবে না। কী মুশকিল।

আমি আর একটু মোটা গলায় তোতলামি করে বলি—আ-আমি তো বো-ও-ও-ল্‌লাম আ-আবদুদুল বা-আরি।

—কী মুশকিল। সুন্দর বলেছ তো। ভাল হয়েছে। তুমি তবে এখন থেকে তোতলা। ওর সঙ্গেও এইভাবে কথা বলবে।

—আ-আচ্ছা।

—বাঃ।

সব কথাবার্তাই আমি বলছি। একটু হাসছিও মাঝে মাঝে। কিন্তু আমার বুকের ভেতরে সবসময় কুরে কুরে খাচ্ছে। কেন এইসব অভিনয়। কেন বেঁচে থাকাব জন্যে এত কষ্ট করা। পৃথিবীতে তো আমার কিছুই নেই। কিছু করারও নেই। মনের মধ্যে সব সময়

খিজির। কত সময় চমকে উঠি। মনে হয় কে ডাকছে—দেবল? পরক্ষণেই বুঝতে পারি। খিজিরই ডাকছে বটে, তবে আমার মনের ভেতর থেকে আসছে সেই ডাক। বিজয়মন্দিরে অন্যসবার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে একাকার হয়ে সেও পড়ে রয়েছে। পড়ে রয়েছে তার ইহকালের চিহ্নটুকু। আর বাকি চিহ্ন তো আমি। আমি যে শুধু তারই। আমাকে চায় মুবারক, এত স্পর্ধা। তার পরিণতি দেখতেই হবে আমাকে। আমি বাঁচব।

মোল্লা সাহেব বলে—কী মুশকিল। তোমাদের আসল কথাটাই বলা হয়নি। আমার পরিচয় মৌলবী বলে। সবাই বলে মৌলবী সাহেব, মৌলবী আবদুল বারি। মোল্লা সাহেব কখনো বলো না। মনে থাকবে?

নাদিরা বলে—হ্যাঁ মৌলবী সাহেব।

গভীর রাতে মৌলবী সাহেবের বাড়িতে পৌঁছলাম। রাস্তা থেকে একটু দূরে বলে মনে হল। বেশ বড় বাড়ি। কয়েকটা ঘর রয়েছে। আমাদের অভ্যর্থনা জানাল কয়েকটি কুকুর। তারা ডাকতেই থাকে। তারা বোধহয় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিল চাতালে। পাশের বাড়িটা একটু দূরে। তবু কোনও বৃদ্ধের ঘুম-ভাঙা বিরক্তির ধমক—চুপ, চুপ।

শেষে কুকুরগুলো মৌলবী সাহেবকে ঘরের দরজা খুলতে দেখে নিস্তেজ হয়ে যায়। কীভাবে তারা কে জানে। আমরা স্বস্তি পাই।

পরদিন আশেপাশের সবাই জেনে গেল আমাদের অস্তিত্ব। কিন্তু তাদের, বিশেষত মেয়েদের কৌতূহল বড় বেশি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কতভাবে যে জেরা করল ভাবা যায় না। আমি কর্কশ কণ্ঠে তোতলামি করলাম। শেষে নাদিরা ভার নিতে বেঁচে যাই। তবু মেয়েরা প্রথমে আমার প্রতি বেশি কৌতূহল দেখায়।

একজন বলে—বোরখা ওঠাও। এখানে পুরুষ নেই।

নাদিরা বলে—মুখ দেখাতে ইচ্ছা করে না। তালাক দেওয়া বিবিদের মুখ দেখে কী হবে? দেখাব। মাসখানেক যাক। আমাদেরই তো সব জোগাড় করে নিতে হবে পেটের জন্যে। ঘরে বসে থাকব না।

মৌলবী সাহেবকে আমরা দুটো স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বলি—যে কোনও ভাবে হোক ভাঙিয়ে দিন।

—কি মুশকিল। শেষে আমাকে চোর বলে ধরবে যে।

—আপনাকে ব্যবস্থা করতেই হবে।

—তা তো বুঝলাম। দেখি। তোমাদের আর কী লাগবে বলো।

—দুটো সাধারণ বোরখা। আর প্রত্যেক দিনের খেতে যা লাগে।

—সব কি একদিনে হয়? কী মুশকিল। ঠিক আছে। দুদিনের সব কিছু আমি এনে দিচ্ছি। আর কয়েকজনকে বলে রাখছি। তারা তোমাদের বাড়িতে এসে যা কিছু দরকার সব দিয়ে যাবে। গোস্তও।

নাদিরা বলে—বকরা ছাড়া আর কিছু নয়। খাসি।

—ঠিক আছে। দেখি।

সব কিছু ব্যবস্থা করে দিয়ে মৌলবী সাহেব পরদিন অপরাহ্ণে বিদায় নিলেন। বললেন—পনেরো-বিশ দিন বাদে আবার আসবেন। উনি যাওয়ার সময় আমাদের মনে হল আমরা যেন পৃথিবীর শেষ অবলম্বন হারিয়ে ফেলছি।

মেয়েরা আরও কয়েকদিন আমাদের বাড়িতে দল বেঁধে এল। শেষে হাল ছেড়ে দিল। একজন বৃদ্ধ আমাদের প্রতিদিনের জিনিসপত্র এনে দিতে শুরু করল। সে বলল, শাকসব্জি লাগাতে। তাতে অনেক সুবিধা। আমরা উদ্যোগী হলাম। এইভাবে ধীরে ধীরে আমরা বাইরে যেতে শুরু করলাম। আমি আমার রঙকে চাপা দিতে নাদিরার পরামর্শ মতো কয়েকটি ব্যবস্থা নিলাম। কাজ হল।

নাদিরা প্রতিদিন আমাদের পানীয় জল একটু দূরের একটা কুয়ো থেকে আনত। তার জন্য দড়ি আর পাত্রও ছিল। মৌলবী সাহেব এসে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ওকে ওভাবে জল আনতে দেখে আমার কষ্ট হত।

—এবার থেকে আমিও জল আনব।

—আপনি পারবেন না। আমার অভ্যাস রয়েছে। ছোটবেলায় এনেছি।

—আমিও অভ্যাস করে নেব।

কীভাবে মাথায় কলসী রেখে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়, ঘরের মধ্যে অভ্যাস করতে শুরু করলাম। তারপর তাতে কিছুটা জল নিয়ে, শেষে পূর্ণ কলস নিয়ে ঘোরাফেরা করলাম।

—এবারে আমি কুয়ো থেকে জল আনব।

—প্রথম দুদিন আমি সঙ্গে যাব।

আমি রাজি হলাম। কিন্তু প্রথমদিনেই মৌলবী সাহেব এসে হাজির।

—কী মুশকিল। আমি এলাম আর তোমরা চললে? কোথায় যাচ্ছ?

আমি বলি—-জল আনতে।

—ভালই হল। আমারও খুব তেষ্টা পেয়েছে। টাট্‌কা জল এলেই খাব।

—নাদিরা তুমি থাকো। মৌলবী সাহেবের কী দরকার দেখ। আমি এখনি নিয়ে আসছি।

কুয়ো থেকে জল তুলে মাথায় রেখে আমি বাড়ির দিকে রওনা হলাম। প্রথম প্রথম একটু ভয় করছিল। তারপর ভয় কেটে গেল। কিন্তু কলসী থেকে ছলাৎ ছলাৎ করে কয়েকবার জল পড়ে আমার বোরখা ভিজল। তবু দূরে নাদিরা আর মৌলবী সাহেবকে দেখে আমার খুব আনন্দ হল। তারা দুজনা বাইরে বসেছিল। নাদিরা দুহাত তুলে কেমন যেন করছিল আমাকে দেখে।

আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সে কেঁদে ওঠে—বেগমসাহেবা!

কথাটা শুনেই আমার মাথা থেকে জলভরা কলসি সশব্দে মাটিতে আছড়ে পড়ে। সেটি না ভাঙলেও আমাদের এতদিনের অভ্যাস, এত সাবধানতা সব খানখান্ হয়ে ভেঙে পড়ল। দুজনে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে মৌলবী সাহেবের দিকে চেয়ে রইলাম।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতার পর মৌলবী সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে বলে—তোমরা কে?

এবার আমি সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে বলি—আমরা আরও কিছুদিন বাঁচতে চেয়েছিলাম মৌলবী সাহেব। হল না বাঁচা। তাতে তেমন দুঃখ নেই অবশ্য। এতদিন তো আপনিই বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

—এত কথার দরকার নেই। আসল কথা শুনতে চাইছি।

আনোয়ারা এবারে বল—আমি নাদিরা নই। আমি ওঁর বাঁদী। আনোয়ারা।

—আর উনি?

—উনি সুলতান আলাউদ্দিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র খিজির খাঁয়ের বেগম খাঁকে গোয়ালিয়রে বন্দী করে প্রথমে অন্ধ করা হয়েছিল। তারপর খুন।

মৌলবী সাহেব আমার দিকে কেমন করে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলে ওঠে—সালাম বেগমসাহেবা। আমি না চিনে আপনার সঙ্গে কত খারাপ ব্যবহার করেছি। আমি আপনার স্বামীর গুণগ্রাহী। তিনি নিজামউদ্দিন আউলিয়ার ভক্ত ছিলেন। আমিও তাই। আমাদের মধ্যে অধিকাংশই আপনার স্বামীর সুলতান হওয়ার অপেক্ষা ছিলাম। তারপর কী যে হয়ে গেল।

আনোয়ারা বলে—আপনি আমাদের বাঁচতে দেবেন?

—প্রাণ দিয়ে। এখন যিনি সুলতান হয়েছেন, তিনি নিজামউদ্দিন আউলিয়াকে দুচোখে দেখতে পারেন না। তাঁকে শেষ করে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। পারবেন না। নিজেই শেষ হয়ে যাবেন। দেখে নিও।

আনোয়ারা বলে—শুধু সেইটুকুই দেখার জন্য আমরা বাঁচতে চাই। তারপর আপনি আমাদের মেরে ফেলবেন।

—কী বলছ তুমি? আমি ওই মসজিদ ছেড়ে এসে তোমাদের কাছে থাকব। কোনও অসুবিধা হবে না তো?

—না। আমরা অভিভাবক পাব।

—বেগমসাহেবা আপনার অসুবিধা হবে?

—একটুও না। আপনি আমাদের পিতৃতুল্য।

—কী মুশকিল। আমি নগণ্য ব্যক্তি।

—তবু আমরা আপনার মেয়ের মতো। আর আপনি কখনই নগণ্য নন। আপনি মানুষের মতো মানুষ, যাঁর আশ্রয় পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

মৌলবীর চোখ দুটো বাষ্পাচ্ছন্ন হয়। সে বলে—কোথায় দিল্লির সুলতানের বেগম হতেন, তাঁর এই পরিণতি? বড় গাছকে ঝড়ের দাপট অনেক বেশি সইতে হয় একথা জানি। সেটা এতদিন কথার কথা বলে ভাবতাম। এখন মর্মে মর্মে অনুভব করছি।

—কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলছি মৌলবী সাহেব। আর একবারও আমাকে বেগমসাহেবা বলবেন না। আমি হাসিনা।

—আমি বলতে পারব না।

—তাহলে কোনও নামেই ডাকতে হবে না। কিন্তু আনোয়ারাকে নাদিরা বলে ডাকবেন।

এরপর একদিন মৌলবী আবদুল বারি মসজিদের ভার অন্যের হাতে সমর্পণ করে চলে এলেন আমাদের কাছে।

কিছুদিন অতিক্রান্ত হতে না হতে অবশেষে বহু-প্রার্থিত সংবাদ এসে পৌঁছলো এই নিস্তরঙ্গ শহরে। সুলতান কুতুবউদ্দিন নিহত হয়েছে। আমারও হৃদয় শান্ত হল মুবারকের দিন এইভাবে ঘনিয়ে আসায়। মানুষের মৃত্যুতে আমি চিরকাল দুঃখ পেয়েছি। কিন্তু দিনের পর দিন যে যন্ত্রণা আমাকে ভোগ করতে হয়েছে, আমার প্রিয়তমকে যেভাবে চোখের সামনে অন্ধ করা হয়েছে, যেভাবে তার মৃত্যু ঘটানো হয়েছে, আমার মায়ের যেভাবে জীবন অবসান হয়েছে, তাতে আমার মন এখন বিকৃত। মুবারকের কথা যখন মৌলবী সাহেব এসে বললেন তখন আনোয়ারা নেচে উঠেছিল। বলতে সঙ্কোচ নেই, আমিও এক অফুরন্ত আনন্দ পেয়েছিলাম। আনোয়ারা বলে উঠেছিল—আজ শুধু খাওয়া-দাওয়া। কী খেতে চান বেগমসাহেবা?

মৌলবী সাহেবও উৎসুক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকে। আমি বলি—আজ আমি সারাদিন কিছু খাব না নাদিরা। আমি শুধু খিজিরের কথা চিন্তা করে যাব। তোমার সব কাজকর্মে অবশ্য সাহায্য করব। তবে আমাকে বেশি কথা বলতে বোলো না। আর একটা কথা বলে দিই, আমাকে বেগমসাহেবা বলে বিব্রত করো না তোমরা, এটা আমার অনুরোধ। আমি হাসিনা হয়েই থাকতে চাই।

আনোয়ারা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে বুঝতে পারি। কিন্তু কী করব। এই শুভক্ষণে খিজিরের কথা চিন্তা করা ছাড়া আর তো কিছু নেই। অশ্রুধারায় ওর রক্তাক্ত দেহমন ধুয়ে দিয়ে সেই স্বপ্নমাখা দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকা খিজিরকে যে অনুভব করতে চাই।

মৌলবী সাহেব বলে ওঠেন—কী মুশকিল। আমার যে নমাজে যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। যাই।

এইভাবে দিন যায়। কয়েক বছরও কাটে। আনোয়ারা আর মৌলবী সাহেব আমাকে কুয়ো থেকে জল আনতে না দিলেও, আমি আনোয়ারার সঙ্গে যাই। কখনো সখনো সে আর মৌলবী সাহেব ঘরে না থাকলে একা একা গিয়ে নিয়ে এসে বাগানের গাছগুলোর গোড়ায় ঢেলে দিয়ে খালি কলসি রেখে দি।

এইরকমই একদিনে জল আনতে গিয়েছি। দেখি কালো আলখাল্লা পরা শ্বেতশুভ্র শ্মশ্রুগুম্ফ সমন্বিত এক ফকির পাশ দিয়ে যেতে যেতে থমকে যায়। সে একটু এগিয়ে এসে বলে—আমি তৃষ্ণার্ত। একটু জল পাব?

আমি হেসে বলি—এরজন্যে কি অনুমতি লাগে? এ তো সবার।

—বাঃ, কি মিষ্টি কথা আপনার। আপনার ভাল হোক।

মনে মনে ভাবি, অনেক ভাল হয়েছে, আর ভালতে কাজ নেই। আমি জানি ফকিরকে আমি নিজে ওভাবে পাত্র থেকে জল দিতে পারব না। বেশি ঢেলে দেব। কখনও ওভাবে দিইনি।

—আপনি নিজেই ঢেলে নিন আপনার সুবিধা মত।

—তাই ভাল।

ফকির আস্তিন গুটিয়ে জল খেতে গেলেই আমি তার বাঁ হাতের সেই ভয়ঙ্কর ক্ষতচিহ্ন দেখে চমকে উঠি। এ তো পরিচিত চিহ্ন। আমি তখন ফকিরের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে থাকি। মিল খুঁজে পাই একটু একটু করে। বিশেষ করে তার ভঙ্গিটি। কতদিন জানলার দিয়ে ফটকের সামনে তাকে দেখতাম।

ফকিরের খাওয়া শেষ হতেই আমার মুখ ফস্‌কে বের হয়—মুনির!

চমকে উঠে ফকির ভয়ার্ত স্বরে বলে—কে?

—ভয় নেই। দুনিয়ার একজনও যদি তোমাকে ধরিয়ে দিতে চায়, আমি সে নই।

বারবার কুর্নিশ করে ফকির ভগ্নকণ্ঠে বলে—বেগমসাহেবা!

—চুপ কর মুনির। বেগমসাহেবা নই। কুর্নিশও নয়।

—ঠিক আছে বেগমসাহেবা। কিন্তু এখন দেখছি আমি ধরা দিলে ভাল করতাম। এই দৃশ্য দেখতে হত না।

চিরকালের নির্দয়তা নিষ্ঠুরতা যার মুখে স্পষ্টভাবে ফুটে থাকে যে অনেক খুনের খুনী, সেই ফকির সাহেব ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে।

—তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে মুনির?

—হ্যাঁ, অনেক চেষ্টায় ওদের দলে ভিড়েছিলাম। আর ওই বদমাশটাকে আমি নিজে খুন করেছি। ওর শেষ মুহূর্তের ভয়ার্ত চাহনি এখনও আত্মাকে তৃপ্তি দেয়। আমি জানতাম কুতুবউদ্দিন আমাদের কাউকে বাঁচিয়ে রাখবে না। ওর চরিত্র আমি জানতাম। তাই বাকিরা বাঁচতে না পারলেও আমার গা স্পর্শ করতে পারেনি।

—কিন্তু এখনে তো সে নেই।

—হ্যাঁ নেই। ওরই এক ক্রীতদাস হাসান ওকে শেষ করে দিয়েছে। হাসান হল আর এক কাফুর। কুতুবউদ্দিন তাকে খুসরু খাঁ উপাধি দিয়েছিল। দিল্লির এখনকার হালহকিকত আমি ঠিক জানি না। জানলেও আমার পক্ষে ওখানে থাকা নিরাপদ নয়। তা ছাড়া আপনাকে দেখে আমার বাঁচার ইচ্ছা চলে গিয়েছে। এইভাবে ভেসে বেড়াব। অন্যের প্রাণ নিতে এককালে কোনও কষ্ট হয়নি। কিন্তু সেইভাবে নিজের প্রাণ নেওয়া যায় না। আসলে আমি ভীতু।

—আমি চলি মুনির।

আবার কুর্নিশ করে মুনির বলে—পরে কখনও যদি এখানে আসি আপনাকে দেখে যাব বেগমসাহেবা।

সে চলে যায়। সেইদিকে চেয়ে জল তুলতে ভুলে গিয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে কলসী মাথায় আঙিনায় এসে দেখি মৌলবী সাহেব বসে রয়েছেন আমার দিকে চেয়ে।

আমি বলি—এক ফোঁটা জল ছিল না। তাই—

—জল ছিল। আমি বাইরে যাওয়ার আগে সব সময় দেখে যাই।

আমি চুপ করে থাকি।

মৌলবী দুঃখের সঙ্গে বলে—আমার বড় কষ্ট হয় এসব দেখলে বেগমসাহেবা।

—আমি কথা দিচ্ছি আর আনব না।

—ওই ফকির কে?

—কালো আলখাল্লা পরা? ও তো ফকির।

সেই সময় আনোয়ারা বলে—হ্যাঁ, একজন ফকিরকে যেতে দেখলাম রাস্তা দিয়ে।

মৌলবী সাহেব বলে—ওই ফকির আপনাকে খুব ভালভাবে চেনে।

আনোয়ারা বলে ওঠে—ফকির ওঁকে চেনে? কী করে?

আমি শান্ত স্বরে বলি—মুনির।

আনোয়ারা থমকে গিয়ে বলে—মুনির? কস্‌র্‌-ই-লালের মুনির?

--হ্যাঁ নাদিরা। কাজ শেষ করেই ও দিল্লি ছেড়ে পালিয়েছিল। ও আমার কাছে জল চেয়েছিল। আস্তিন গুটিয়ে খেতে যাওয়ার সময় ওর সেই ক্ষতস্থান দেখে চিনে ফেলি। আমাকে চিনবে কী করে? বোরখা না পরলেও তো চিনতে পারত না।

—তা তো ঠিকই। ওই ফকিব মুনির! ইস্‌ আমার ইচ্ছে করছে ছুটে গিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলে আসি। কিন্তু তাতে সবার বিপদ।

মৌলবী সাহেব এবারে বলে—কী মুশকিল। আমি তো কিছুই বুঝতে পারলাম না।

আনোয়ারা বলে—আগে আমি জল নিয়ে আসি।

আমি বলি—আমি তো জল এনেছি।

--ওই জল আমি খাব না।

—আমি জল আনতে না গেলে মুনিরের সঙ্গে দেখা হত না নাদিরা।

আনোয়াবা আব কিছু বলে না। সে বলে—এরপরে আর কখনও যদি আপনাকে জল আনতে দেখি তাহলে আমার ভাগেরটা আমি শেষ করে ফেলব।

বুঝলাম বিষের বড়ির কথা বলছে সে।

মৌলবী সাহেব বলে—তোমাদের কথার মধ্যে আমার থাকা উচিত নয় বুঝি, তবু বেগমসাহেবার নিরাপত্তার জন্যই আমি জানতে চাইছিলাম।

আমি বলি --আপনাকে সব বলা আমার অবশ্য-কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। তবে আজকের ঘটনার কথা কল্পনাও করতে পারিনি বলে তার ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। নাদিরা আপনাকে সব বলবে।

মৌলবী সাহেব মারা গিয়েছে। মৃত্যুর আগের মাসখানেক আমার সেবা নিতে তার লজ্জার শেষ ছিল না। তবু নিতে সে বাধ্য হয়েছিল অপারগ হয়ে। নিজের বিন্দুমাত্র ক্ষমতা ছিল না, তার ওপর আনোয়ারা সেই সময় অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। বাইরের লোকেদের সামনে মৌলবীসাহেব দুএকবার আমাকে 'বেগমসাহেবা' বলে ডেকে উঠত।

তারা বলাবলি করত এত ভাল মানুষটার শেষ পর্যন্ত মাথাও ঠিক রইল না। সেই সময় মেয়েদের সামনে আমি বোরখা পরা ছেড়ে দিলাম। বয়স হয়ে গেলেও প্রথমে আমাকে দেখে তারা প্রত্যেকেই চমকে উঠেছিল। পুরুষদের কথা শুনে তারা বলেছে, মৌলবীসাহেব বেগমসাহেবা বলে ভুল করেননি। এক সময়ে অত্যন্ত রূপসী ছিল মেয়েটা। বেগমমহলে এই বয়সে অমন রূপ খুঁজে পাওয়া যাবে না। পুরুষেরা বলাবলি করত তাহলে সত্যিই কোনও বেগম নাকি? আনোয়ারা সুস্থ হয়ে এসবের মোকাবিলা করেছে। এখন আর কারও অতিরিক্ত আগ্রহ নেই।

এরপরেও দিন কাটছে। আমি জানি খিজিরের মৃত্যুর পর থেকে আমার কথা শোনার আগ্রহ তোমার হ্রাস পেয়েছে। সুলতানী খানা বানাতে গেলে অনেক রকমের মশলার প্রয়োজন হয়। সেই মশলা না থাকলে খানা একেবারে সাধারণ পর্যায়ে নেমে আসে। তা কি ভাল লাগে? আমার গায়ে যতদিন সুলতানী খুশবু ছিল ততদিন তোমার আগ্রহ ছিল। এখন আমি বলতে গেলে তোমাদেরই পর্যায়ের। শুধু এখনের অবশিষ্ট কতকগুলো সোনার মোহরের সুলতানী চিহ্ন রূপে রয়ে গিয়েছে। সোনার দাম চিরকালই থেকে য' রূপ কিন্তু অবিনশ্বর নয়।

এই হল আমার কাহিনী। এখন হয়ত দিল্লীর রাজপথে নিজের পরিচয় ঘোষণা করলেও কেউ বিশ্বাস করবে না। করলেও সেখানকার সুলতানের মনে ভীতির সঞ্চার করবে না। তবে সামান্য চাঞ্চল্যের সৃষ্টি তো হবেই। আমি সেইটুকুও হতে দিতে চাই না। আমি বিস্মৃতির মধ্যে বিলুপ্ত হতে চাই। কতকিছু হয়ত রটেছে আমাকে নিয়ে। আমার কানেও এসেছে কিছু কিছু। কিন্তু একথা হয়ত রটবে না যে আমি মুবারক বা পরবর্তী কোনও সুলতানের বেগম হয়ে তার দম্ভকে উস্‌কানি দিয়েছি। তাও যদি রটে তাহলে বুঝতে হবে বিধাতাও আমাকে বর্জন করেছেন।

এবার তুমি যাও। আমি একটু ভাবতে বসব। যাওয়ার আগে এক কলসি জল এনে দিয়ে যাবে?

———